ভাষা-আন্দোলনে ইতিহাস বিকৃতি:
তমদ্দুন মজলিস ও কমিউনিস্ট পাটি

ভাষা-আন্দোলনে ইতিহাস বিকৃতি:
তমদ্দুন মজলিস ও কমিউনিস্ট পার্টি

আহমদ রফিক

বিপ্লবীদের কথা

ভাষা-আন্দোলনে ইতিহাস বিকৃতি ২

ভাষা-আন্দোলনে ইতিহাস বিকৃতি:
তমদ্দুন মজলিস ও কমিউনিস্ট পার্টি

প্রকাশক
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তিভবন নিচতলা
(কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
সেল: ০১৭২৬-১২৩৫৫০, rafiqcpb@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রচ্ছদ
মেহেদী বানু মিতা

মেকআপ
বিপ্লবীদের কথা

বর্ণ বিন্যাস ও বানান শুদ্ধিকরণ
বিপ্লবীদের কথা

ছেপেছেন
মাটি ও মানুষ, ১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

বাঁধাই
রবিন অ্যান্ড ছোঁয়া বুক বাউন্ডিং, ২৪৫/এ ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৯১৮৮৭-৭-৩

মূল্য: দুইশত বিশ টাকা

অনলাইনে পেতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/biplobiderkotha

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে

সংগ্রামী শুভেচ্ছা

কেন লেখা

পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে ভাষা-আন্দোলন প্রথম ব্যাপক ছাত্রজনতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল, প্রাথমিক লক্ষ্য যদিও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলার প্রতিষ্ঠা তবু এর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল বহুমাত্রিক। পাকিস্তানে এই প্রথম পাক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রআন্দোলন সারা প্রদেশব্যাপী গণআন্দোলনে পরিণত হয়। এর সূচনা শহর ঢাকায় হলেও ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন স্কুল কলেজের মতো শিক্ষায়তন কেন্দ্র করে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।

এ আন্দোলন চরিত্রগুণে এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রিক রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখার কারণে জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নেয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রথম স্বীকৃতি ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের সংবিধানে। পরে ১৯৭২ সনে স্বীকৃতি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে 'একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস' ইউনেস্কোর ঘোষণায় হয়ে ওঠে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। ভাষা-আন্দোলনের এই গুরুত্ব অনস্বীকার্য মর্যাদার।

তা সত্ত্বেও, বহুখণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের ইতিকথা ও দলিলপত্র সংকলনের মতো একাধিক খণ্ডে ভাষা-আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস প্রণয়ন ও দলিলপত্র সংকলন প্রকাশের দায়িত্ব জাতীয় সরকার গ্রহণ করে নি। করে নি 'বাংলা একাডেমি'ও। বিস্ময়কর এ অপ্রিয় সত্য। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে লিখিত হয়েছে ভাষা-আন্দোলনের গোটাকয় নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ ও দলিলপত্রের দু'একটি সংকলন।

ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্বের কারণেই হয়তো এ বিষয় নিয়ে ব্যক্তি ও দলবিশেষের স্বার্থে কিছু 'ফ্রি স্টাইল' লেখাও হয়েছে, মূলত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ও কিছুসংখ্যক ছোট গ্রন্থ। বলাবাহুল্য এমন কিছু কিছু লেখায় তথ্য ও ইতিহাস বিকৃতি ঘটেছে বিশেষ উদ্দেশে। আমাদের লক্ষ্য ইতিহাসের বিকৃত তথ্যের সংশোধন নিশ্চিত করা। দুর্ভাগ্য আমাদের যে এ জাতীয় ইতিহাস-বিকৃতির প্রতিবাদ জানাতে ভাষাসংগ্রামী, লেখক, ইতিহাসবিদ কেউ এগিয়ে আসেন নি।

এ প্রবণতা ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসের জন্য শুভলক্ষণ নয়, নয় বাঙালি জাতির জন্যও।

এ ইতিহাস-বিকৃতির চরিত্র নানামাত্রিক এবং তা বিশেষভাবে ব্যক্তি ও সংগঠনকে কেন্দ্র করে। নেপথ্যে মতাদর্শগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, কখনো ব্যক্তিকে উচ্চে তোলার চেষ্টায়, কখনো কোনো সংগঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করাও লক্ষ্য। এছাড়া রয়েছে ভাষাসংগ্রামী কারো কারো স্মৃতিচারণে ও রচনায় বিস্মৃতির কারণে ভাষা-আন্দোলনের তথ্যবিকৃতি। সেখানে বাদ যায় নি ঘটনা, তথ্য ও দিন-সনের ভুলভ্রান্তিও।

বিস্ময়কর যে এ যাত্রায় ভাষাসংগ্রামীদেরই কেউ কেউ ভাষা-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে যুক্তিহীন অভিযোগ এনেছেন, যেমন অলি আহাদ, গাজীউল হক, এম. আর. আখতার মুকুল যারা বামপন্থী বা জাতীয়তাবাদী ঘরানার রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত। উদ্দেশ্য বোঝা কঠিন। অবশ্য এদের কারো কারো লেখায় নিছক স্মৃতিবিভ্রমজনিত তথ্যগত ভুলত্রুটিও প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু মতাদর্শগত উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি ঘটানো এবং বিশেষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যুক্তিহীন অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, এবং তা ভাষা-আন্দোলনের ঊষাকাল থেকে। তাদের মূল অভিযোগ কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা-আন্দোলনে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে নি, বরং আন্দোলন 'স্যাবোটেজ করেছে'। এ অভিযোগ ছিল কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের বিরুদ্ধেও যা আদৌও সঠিক ছিল না। এ তত্ত্বের প্রবক্তা মূলত তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং তার নিকট সহকর্মীদের কেউ কেউ।

তবে দীর্ঘকাল পর বিষয়টিকে অশুভ গুরুত্বে পৌঁছে দিয়েছেন অধ্যাপক কাসেমের ভক্ত এবং তমদ্দুনী আদর্শে বিশ্বাসী কেউ কেউ। এদের মধ্যে একাজে বিশেষ তৎপর জনাব এম.এ. বার্নিক। তার উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাস-বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে 'প্রথম আলো'সহ একাধিক জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক লেখায়। তার লেখার বৈশিষ্ট্য প্রথমত এমন দাবিতে যে, ১৯৪৮-১৯৫২ পর্যন্ত ভাষা-আন্দোলনে একক অনন্য ভূমিকা তমদ্দুন মজলিসের এবং এ 'আন্দোলনের জনক অধ্যাপক আবুল কাসেম।' এ

উদ্দেশসাধনে প্রদেশব্যাপী আন্দোলনে যুক্ত বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে তমদ্দুন মজলিসের লেবাস পরিয়ে দেওয়া হয়েছে যদিও তারা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী।

এভাবে তার লেখায় বামপন্থী ভাষাসংগ্রামী অনেককে তমদ্দুন মতাদর্শে দীক্ষিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি জাতীয়তাবাদী কোনো কোনো আওয়ামী লীগ নেতাকে একই ভাবে তমদ্দুন মজলিসি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও এ জাতীয় বিকৃতি তার লেখায় ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান।

ভাষাসংগ্রামীদের কেউ এ বিষয়ে প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন নি। তবে 'প্রথম আলো'য় প্রকাশিত এ জাতীয় একটি লেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন ডা. কর্নেল শরফুদ্দিন আহমদ এবং ডা. সাঈদ হায়দার। অন্যত্র অনুরূপ এসব লেখার প্রতিবাদ হয় নি। প্রতিবাদহীন এ জাতীয় তৎপরতার বিপদ হচ্ছে ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকগণ হয়তো এসব লেখা প্রামাণ্য বলে ধরে নেবেন। সেক্ষেত্রে তা হবে ইতিহাসের জন্য চরম দুর্দশার। ইতিহাস বিকৃতির এ ধারাবাহিকতায় জনাব বার্নিক একই ভাবে নিয়মিত লিখতে থাকেন ভাষা-আন্দোলনের চরিত্র হনন করে।

ইতোমধ্যে প্রকৌশলী জিয়াউল হক 'ভাষা-আন্দোলন সারগ্রন্থ'সহ গোটা দুই বই আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অনুরোধ জানান এ সম্পর্কে সত্য উদ্ঘাটন করতে। সারগ্রন্থ বইটি পড়ে অবাক হয়েছি। এটি অবিশ্বাস্য রকম ভুল তথ্যে ভরা এবং তা সবই তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে। অর্থাৎ তার মতে ভাষা-আন্দোলন মানে তমদ্দুন মজলিস এবং আন্দোলনের 'জনক' অধ্যাপক আবুল কাসেম।

দুটো দাবিই পুরোপুরি তথ্যনিষ্ঠ নয়, যদিও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ভাষা-বিক্ষোভ ও আন্দোলনের আদিপর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ পর্বে অন্যান্যদের পাশাপাশি তমদ্দুন মজলিসের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যা ১৯৫২ ফেব্রুয়ারিতে এসে অতীব গৌণ পর্যায়ে। এ সত্য জনাব বদরুদ্দীন উমর তার ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এসব তথ্যবিকৃতি মাঝে মধ্যে বড় উদ্ভট। ভাবা যায় এমন দাবি যে জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান 'তমদ্দুন ভাবাদর্শে পুষ্ট রাজনীতিবিদ!'

দুই

স্বভাবতই একজন ভাষাসংগ্রামী হিসেবে ভাষা-আন্দোলন সংক্রান্ত ইতিহাস বিকৃতির ভ্রান্তিমোচনের উদ্দেশ্যে ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিস ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকায় আন্দোলন বিষয়ক সঠিক তথ্যাদি তুলে ধরার দায় গ্রহণ করে লেখায় হাত দিতে হয়েছে। এ ধরনের অপ্রিয় কাজে হাত দিতে কারই বা মন চায়? তবু ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠা বলে কথা। আর বিশেষ করে সেটা যখন ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে। তাই হাত গুটিয়ে বসে থাকা সঠিক মনে হয় নি।

আমার মনে হয় যেকোনো ভাষা-সংগ্রামীর পক্ষেই এ কাজ এক ধরনের নৈতিক দায় যা পালন করতেই হয়। এতে ব্যক্তিবিশেষ ক্ষুণ্ন হলেও পিছিয়ে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য ভাষা-আন্দোলনে ব্যক্তিবিশেষের বা কোনো সংগঠনের ভূমিকা খাটো করে দেখানো নয়। লক্ষ্য যার যতটা ভূমিকা তাই তুলে ধরা, সেই সঙ্গে ইতিহাস-বিচারে ভুলত্রুটিগুলো চিহ্নিত ও সংশোধন করা। একাজ যথাসাধ্য নির্মোহভাবে করা হয়েছে, কোনো মতাদর্শ বা সংগঠনের প্রতি অন্ধ সমর্থন বা বিরূপতার প্রকাশ না ঘটিয়ে। এককথায় এ রচনার লক্ষ্য সত্য ঘটনার উপস্থাপন।

তিন

এ রচনাটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এবং তা পাঠকের সুবিধার জন্য। শুরুতে ভাষা-আন্দোলনের অতিসংক্ষিপ্ত বয়ান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির এবং তার গণসংগঠনগুলোর (যেমন যুবলীগ) ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কথা। এক্ষেত্রেও বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চতুর্থ অধ্যায়ে ঢাকাসহ গোটাদেশে ভাষা-আন্দোলনের মূল নেতাকর্মী ও সংশ্লিষ্টদের মতাদর্শিক পরিচয়সহ নাম প্রকাশ। তবে নেতৃত্বে বেশ কিছু সংখ্যক ছিলেন নিছক ভাষাপ্রেমী, রাজনৈতিক মতাদর্শনিষ্ঠ নন।

ভাষা-আন্দোলনের গুটিকয় ইতিহাসগ্রন্থে সঙ্গত কারণেই ব্যক্তিগত নাম তালিকা বিস্তারিতভাবে আসে নি, তবে অনেকটা এসেছে আঞ্চলিক ইতিহাসে। এদের মতাদর্শিক পরিচয় ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের একপেশে,

একতরফা দাবি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করবে। এ প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধতার কথাও বলতে হয়। বইটি যেহেতু সীমিত আকারে বিশেষ লক্ষ্য অর্জনে লেখা তাই এবং তথ্যসূত্রের সীমাবদ্ধতার কারণে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় সবার নাম বিবরণে উঠে আসে নি। এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ নতুন নাম বা ঘটনা কেউ সংযোজন করতে চাইলে খুশি হবো।

আগেই বলেছি বইটি ছোট আয়তনের। কারণ এটি ভাষা-আন্দোলনের প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস নয়। এটি লেখার পেছনে রয়েছে দুটো সংগঠন ঘিরে ভাষা-আন্দোলন সংক্রান্ত বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিপরীতে সত্য ঘটনার প্রকাশ এবং বিশ্লেষণ। তাই রচনাটি অনাবশ্যক বক্তব্যের ভারে দীর্ঘ নয়। এর পেছনে আরো উদ্দেশ্য যাতে এটি বহুজন পঠিত হয়। সম্ভব হলে ভবিষ্যতে ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের ইচ্ছা রইল।

বইটি প্রকাশের জন্য 'বিপ্লবীদের কথা'র স্বত্বাধিকারী অনুজপ্রতিম শেখ রফিককে অশেষ ধন্যবাদ। সবশেষে মনোযোগী পাঠকের জন্য একটি কথা বলা দরকার যে বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখা এ বইটিতে বিভিন্ন অধ্যায়ের সুবাদে অনিবার্য কারণে বেশ কিছু তথ্য ও ব্যক্তিনাম একাধিক বার উঠে এসেছে। এ পুনরুক্তি এড়ানো সম্ভব ছিল না।

আহমদ রফিক
২০১৭

সূচি

ভাষা-আন্দোলনের কথা ১১
ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা ৩৬
ভাষা-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার গণসংগঠন ৭১
ভাষা-আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ও সক্রিয় বিশিষ্টজন ও বিশেষ কিছু ঘটনা (১৯৪৭-'৫৬) ৯৮
বায়ান্নে ঢাকার বাইরে আন্দোলনের বিশিষ্টজন ১০৮
বাহান্ন-পরবর্তী তৎপরতা ১২২
শেষকথা ১২৬

ভাষা-আন্দোলনের কথা

রাজনৈতিক পটভূমি

ভাষা-আন্দোলনের কথা জানতে ও বুঝতে এর রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কেও কিছু জানা দরকার। ইংরেজ বণিকশক্তি ভারতবর্ষ দখল শুরু করে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার তৎকালীন রাজশক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। এ জয় স্বাভাবিক জয় ছিল না। এর পেছনে ছিল ইংরেজবণিকের কূটকৌশলী ষড়যন্ত্র এবং তাদের সহযোগী কিছুসংখ্যক স্থানীয় দেশদ্রোহীর ক্ষমতার লোভ ও স্বার্থপরতা। এভাবেই ধীরেধীরে ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষ দখল করে নেয়। দেশ জয় করার মতোই তাদের দেশশাসনেরও মূলনীতি ছিল ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নানাভাবে বিভক্ত রাখা (তাদের ভাষায় 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল') যাতে ভারতীয়রা স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

তবু স্বাধীনতার লড়াই ঠিকই চলেছে। বঙ্গে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পর ১৮৫৭ সালে শুরু হয় সারা ভারত জুড়ে সিপাহিবিদ্রোহ যা ইতিহাসে 'মহাবিদ্রোহ' নামে পরিচিত। কারো কারো মতে এ বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। সিপাহিদের ব্যর্থ-অভ্যুত্থানের পর স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী সংগঠনগুলোর চেষ্টা ও তাদের আত্মদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রায় একই সময়ে গণতান্ত্রিক ধারায় গড়ে ওঠে একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিন্দুপ্রধান জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলমানদের সংগঠন মুসলিম লীগ। ধর্মীয় বিভেদ, সম্প্রদায়গত বৈষম্য ও ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি নানা কারণে রাজনৈতিক দলগুলো ইংরেজের বিরুদ্ধে আর কখনো একাট্টা হতে পারে নি, অনৈক্য থেকেই গেছে।

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে ইংরেজের খবরদারিতে ভারতীয় উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়নে বিভক্ত হয়। দেশবিভাগের প্রত্যক্ষ কারণ ইংরেজের কূটবুদ্ধির ষড়যন্ত্র ও ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা তুলে নিয়ে ইংরেজ শাসক ভারতবর্ষ ত্যাগ করে, কিন্তু পেছনে রেখে যায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ। পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ও ভারতে কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে পায় যথাক্রমে ১৪ এবং ১৫ আগস্ট (১৯৪৭)।

ইংরেজ শাসনে বাঙালি মুসলমান নানা কারণে সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই পিছিয়ে ছিল। মুসলমান-প্রধান বিপুলসংখ্যক কৃষকশ্রেণির ওপর চলেছে জমিদারদের, মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার। আর জমিদারশ্রেণি ছিল হিন্দুপ্রধান। পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমান তাই শ্রেণি-নির্বিশেষে মূলত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য স্বতন্ত্ররাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে একাট্টা সমর্থন জানায়। এজন্যেই ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগের একচেটিয়া বিজয়। কিন্তু পশ্চিম ভারতের মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগ এতটা জয় পায় নি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গোটা পাকিস্তানে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই পাকিস্তানকে ঘিরে বাঙালি মুসলমানের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক।

রাষ্ট্রভাষা বাঙলার প্রশ্ন কীভাবে এল

বাঙালিরা জনসংখ্যা বিচারে বেশি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়শাসনে এবং পূর্ববঙ্গের শাসনযন্ত্রে অবাঙালিদেরই ছিল প্রাধান্য। মুসলিম লীগের বাঙালি সদস্যরাও বাংলার স্বার্থের দিকে ফিরে তাকায় নি। হতে পারে রাজনৈতিক প্রভাব ও পদ-মর্যাদা ও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু আগে ও পরে শীর্ষস্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা নানা উপলক্ষে বলতে থাকেন যে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' যেমন ১৭ মে মুসলিম লীগনেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এক বিবৃতিতে বলেন: 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা।' [১] মুসলিম লীগ নেতাদের এ ধরনের বক্তৃতা, বিবৃতির কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে কয়েকজন বাঙালি লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে কলম ধরেন।

কলকাতা তখনো অখণ্ড বাংলার রাজধানী। সেখান থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ইত্তেহাদে' লেখক-সাংবাদিক আবদুল হক 'বাংলা ভাষা-বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যোগ্যতা তথ্য-যুক্তিসহ তুলে ধরেন। [২] সে বছরই তিনি ৩০ জুন দৈনিক 'আজাদ'-এ লেখেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন: 'যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবীই সবচেয়ে বেশি।' [৩]

সাপ্তাহিক 'মিল্লাত'-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়: 'মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না।' [৪] এছাড়া আরও দু-একজন সাংবাদিক বাংলা রাষ্ট্রভাষার

পক্ষে নিবন্ধ লেখেন। এসব লেখা প্রকাশিত হয় ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আনন্দ-উল্লাসের মধ্যেও বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি চাপা পড়ে নি। কারণ লীগনেতাদের বিবৃতি-বয়ানে উর্দু রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়মিত উচ্চারিত হয়েছে। তাই বাংলাপন্থী লেখক-অধ্যাপক কেউ কেউ বাংলার পক্ষে যুক্তি-তথ্য দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন মাসিক 'কৃষ্টি' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় (১৩৫৪) ড. মুহম্মদ এনামুল হক উর্দু রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 'উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মরণ– রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু।'

'সওগাত' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৫৪) ড. কাজী মোতাহার হোসেন 'পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে লেখেন 'যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা করা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।' তার মতে বাংলা ও উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও বাংলার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

অবশ্য একথাও সত্য যে কিছুসংখ্যক বাঙালি কবি, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক উর্দু রাষ্ট্রভাষার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। যেমন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কবি গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক মওলানা আকরম খাঁ, মুজিবর রহমান খাঁ, অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন প্রমুখ। বাঙালি আমলাদের মধ্যে মীজানুর রহমান ছিলেন এ বিষয়ে খুবই সোচ্চার। আর রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন, তমিজুদ্দিন খান ও নুরুল আমিনের মতো সবাই ছিলেন উর্দুর পক্ষে। এরা একজোটে পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনা সত্য।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠী হিসেবে মুসলিম লীগের ছিল একচেটিয়া রাজত্ব। তখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে দাঁড়ানোর মত শক্তিশালী সংগঠন ছিল না। এ অবস্থার মধ্যেই কামরুদ্দীন আহমদের গঠিত (জুন, ১৯৪৭) রাজনৈতিক সংগঠন 'গণআজাদী লীগ, প্রগতিবাদী যুবকদের সংগঠন 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং ইসলামপন্থী সাংস্কৃতিক সংগঠন (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' তাদের গঠনতন্ত্রে ও বক্তব্যে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি তুলে ধরে। একই উদ্দেশ্যে তমদ্দুন মজলিস 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, না

উর্দু' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। পুস্তিকায় সংকলিত প্রবন্ধ তিনটিতে তথ্য ও যুক্তিসহ বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি তুলে ধরা হয়। প্রবন্ধগুলোর লেখক ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম। [৭]

বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে প্রথম বিক্ষোভ

আগেই বলা হয়েছে পাকিস্তানকে ঘিরে বাঙালি মুসলমানের স্বপ্ন ছিল অনেক। কিন্তু পাকিস্তানি জামানার শুরুতেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতি ছাত্রশিক্ষক বুদ্ধিজীবীসহ কিছু সংখ্যক মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। এ ক্ষোভের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রকাশ সরকারি কর্মচারিদের একাংশে। তারা লক্ষ্য করেন, সদ্য প্রকাশিত এনভেলাপ, পোস্টকার্ড, ডাকটিকিট ইত্যাদিতে শুধু ইংরেজি ও উর্দু লেখা, বাংলা নেই। এ ঘটনার প্রতিবাদে নীলক্ষেত ব্যারাকের কর্মচারি অনেকে সভা ও মিছিল করে বাংলার পক্ষে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ছাত্রদের কেউ কেউ ঐ মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলে স্লোগান ওঠেঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,' 'সবকিছুতে বাংলা চাই' 'উর্দুর সঙ্গে বিরোধ নাই' ইত্যাদি। ঘটনাটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এর পেছনে কোনো সংগঠনের উদ্যোগ বা চেষ্টা ছিল না। ঘটনার সময় নভেম্বর, ১৯৪৭। [৮]

এরপর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অধিকতর সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ প্রকাশ পায় করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে (২৭.১১.'৪৭) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায়। বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার অধিকাংশ শিক্ষায়তনের ছাত্রদের সমবেত চেষ্টায় ৬ ডিসেম্বর (১৯৪৭) আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দেন কিছু সংখ্যক শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সরকারি কর্মচারি। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম।

বক্তৃতা করেন মুনীর চৌধুরী, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এ. কে.এম. আহসান প্রমুখ। সভাশেষে মিছিল। স্লোগান ওঠে: 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,' 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' 'উর্দুর জুলুম চলবে না' ইত্যাদি। [৯]

কিন্তু এতে সরকারের টনক নড়ে নি। স্বভাবতই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জোরদার করে তুলতে ছাত্রশিক্ষক বুদ্ধিজীবীসহ তমদ্দুন মজলিস, ছাত্রলীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এর আহবায়ক নুরুল হক ভূঁইয়া। ডিসেম্বরের (১৯৪৭) শেষ

দিকে গঠিত এই সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম, অলি আহাদ, আবুল খায়ের, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী প্রমুখ [৯] বিভিন্ন মতাদর্শের বিশ্বাসী মানুষ।

১১ মার্চ: প্রথম সংগঠিত আন্দোলন

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ, প্রচারপত্র বিলি ইত্যাদি নানামুখী তৎপরতা। এর মধ্যে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে ২৩ ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব আনেন। কিন্তু মুসলিম লীগের বাঙালি-অবাঙালি সদস্যদের বিরোধিতায় সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

গণপরিষদের ঐ অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের খবরে ঢাকার ছাত্রসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষায়তনে ধর্মঘট পালিত হয়। শুরু হয় প্রতিবাদী সভা, কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য বৈঠক, মিছিল ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত হয়, ১১ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হবে। কর্মসূচি সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে ২ মার্চ ব্যাপকভিত্তিতে সংগ্রাম পরিষদ নতুন করে গঠিত হয়। এবার আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। এ কমিটিতেও ছিল নানা মতাদর্শের দ্বন্দ্ব। তবু আন্দোলন সফল করতে মার্চের চার, পাঁচ ও দশ তারিখে পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত হয় কর্মসূচি।

নির্ধারিত ঐ কর্মসূচি অনুযায়ী সচিবালয়ের বিভিন্ন গেটে এবং পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাক, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও রমনা পোস্টঅফিসসহ বিভিন্নস্থানে পিকেটিং করতে গিয়ে নেতাকর্মীরা পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ ও সরকারি গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে আহত হন, গ্রেফতার হন অনেকে। ফলে প্রতিবাদের তীব্রতা বাড়ে এবং তা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় পিকেটিং-এ সরাসরি নেতৃত্ব দেন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, শওকত আলী, নঈমুদ্দিন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আশংকায় মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সংগ্রামের পরিষদের কাছে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব পাঠান। আন্দোলন মাঝপথে স্থগিত করে জেলের বাইরে থাকা সংগ্রাম পরিষদের নেতারা ১৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর

সঙ্গে আটদফার চুক্তিনামায় সই করেন। এবং ঐদিনই জেলে আটক নেতারা মুক্তি পান।

আটদফার মধ্যে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ ও গণপরিষদে তা পাশ করানোর অঙ্গীকার ছিল। পরবর্তীকালে সে অঙ্গীকার তারা রাখেন নি। এমন আশংকা থেকেই সাধারণ ছাত্ররা আন্দোলন স্থগিত করতে চায় নি এবং ১৭ মার্চ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। আন্দোলন স্থগিত করার পক্ষে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায় তমদ্দুন মজলিসসহ জিন্নাহ-ভক্ত নেতাদের।

মুখ্যমন্ত্রীর নিজ উদ্যোগে ছাত্রদের সঙ্গে আপসরফার উদ্দেশ্য ছিল একটাই। আর তা হলো পাক গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন পূর্ববঙ্গ সফর নিরুপদ্রুব করে আপন ভাবমূর্তি রক্ষা করা। অন্যদিকে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আন্দোলন স্থগিত করার কারণ নেতৃত্বের পরস্পর-বিরোধী চিন্তাভাবনা এবং জিন্নাহ সাহেবের আসন্ন সফর। সেজন্য সংগ্রাম কমিটির তরফে জিন্নাহ সাহেবের জন্য একটি অভ্যর্থনা কমিটি' গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে মার্চের আন্দোলন রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ শহরে প্রতিবাদী রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তাতে ছিল জনতার অংশগ্রহণ।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফর

জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় আসেন ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ। তিনি রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় ২১ মার্চ এবং কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৪ মার্চ ভাষণ দেন। তিনি মুসলিম লীগের মাধ্যমে পাকিস্তানের সেবা ও প্রাদেশিকতা বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বলেন: পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দুই। যারা এর বিরুদ্ধে কথা বলে তারা পাকিস্তানের দুশমন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্য তিনি কমিউনিস্ট ও তার ভাষায় বিদেশী চরদের দায়ী করে বলেন যে এদের কঠোর হাতে দমন করা হবে।

কার্জন হলে তার বক্তৃতার সুর ভিন্ন ছিল না। একই রকম দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন যে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, অন্যকোনো ভাষা নয়। রেসকোর্সের জনসভায় তার রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে সেখানে উপস্থিত ভিন্নজনের রয়েছে ভিন্ন মত। কিন্তু কার্জন হলে তার ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধে ছাত্রদের একাংশ থেকে ঠিকই 'নো-নো-নো' প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। ঢাকা ত্যাগের আগে তিনি সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম কমিটির চুক্তি বাতিল করে দিয়ে যান এবং

ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠকেও তিনি তার রাষ্ট্রভাষা-বিষয়ক পূর্বোক্ত মতামতে অনড় থাকেন। একমাত্র ফজলুল হক সাহেব বাদে পূর্ববঙ্গের কোনো রাজনৈতিক নেতা জিন্নাহ সাহেবের বাংলা-বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন নি।

ভাষা নিয়ে সরকার পক্ষে নয়া ষড়যন্ত্র

মার্চের আন্দোলন স্থগিত করা এবং জিন্নাহ সাহেবের উর্দু রাষ্ট্রভাষার পক্ষে বারবার ঘোষণা মুসলিম লীগ নেতাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে শেষোক্ত কারণে সংগ্রাম পরিষদের ডানপন্থী ও মধ্যপন্থী নেতাদের আন্দোলন গড়ে তোলার উৎসাহে ভাটা পড়ে। এ সুযোগে শাসকগোষ্ঠী ভাষা ও হরফ নিয়ে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। যেমন বাংলাভাষাকে ইসলামি ধারায় সংস্কার করা, আরবি হরফে বাংলা লেখা, উর্দু শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকার এসব পরিকল্পনার পেছনে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করতে থাকে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ছিলেন এসব ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক।

উর্দুপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এ সময় উর্দুর পক্ষে প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেন। যেমন 'বাবায়ে উর্দু' নামে পরিচিত ড. আবদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাদানি ও অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন প্রমুখ। রাজনৈতিক নেতারাও বারবার বলতে থাকেন: উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান থেকে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সবাই ঐ একই সুরে কথা বলেন। এমনকি বলেন মওলানা আকরাম খানও। উর্দু নিয়ে এদের অতি-তৎপরতা ভাষা-আন্দোলনের স্থবিরতা কাটাতে কিছুটা হলেও সাহায্য করে।

বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি

সংগঠনগত তৎপরতার অভাব সত্ত্বেও ১৯৫০ সালের দাঙ্গা, অপশাসন ইত্যাদির মধ্যেই ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ছাত্রসভায় আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। বাংলা সমর্থক প্রতিটি দল থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সংগ্রাম কমিটির যাত্রা শুরু হয় ধীরগতিতে। পতাকা দিবস পালন, ইস্তাহার বিতরণ, সভা ও ছোটখাটো মিছিলের মধ্যদিয়ে তৎপরতার লক্ষণ দেখা দেয়।

তৎপরতার কারণ আবারও জুগিয়ে দেয় সরকারি কর্মকাণ্ড। পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির ভাষাবিষয়ক সুপারিশে আবারও বলা হয় উর্দু রাষ্ট্রভাষার কথা। এ সুপারিশের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজে এবং সরকার-

বিরোধী রাজনৈতিক মহলে বিক্ষোভের ঢেউ ওঠে। নভেম্বরের (১৯৫০) চার ও পাঁচ তারিখে প্রতিবাদী সম্মেলন এবং ১২ নভেম্বর সারাদেশে বিক্ষোভ ও মিছিলের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে বাংলাপ্রেমীদের মনোভাব প্রকাশ পায়। ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে মূলনীতি কমিটির সুপারিশ স্থগিত করে সরকার।

ভাষা-দাবির অগ্রযাত্রা: আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

ঊনপঞ্চাশ-পঞ্চাশের বিরূপ পরিস্থিতি কাটিয়ে ১৯৫১ সাল থেকে ভাষার দাবিতে কিছুটা ব্যাপকতা, কিছুটা শক্তির সঞ্চার ঘটতে থাকে। লেখক সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন পেশার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলার প্রতি সমর্থন বাড়তে থাকে। সক্রিয় হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। আহ্বায়ক আবদুল মতিনের স্বাক্ষরে ইংরেজিতে লেখা একটি স্মারকলিপি ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে গণপরিষদ সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়। এর মূল কথা ছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যোগ্যতা প্রতিপাদন। ঐ স্মারকলিপি পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্র মহলেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

সংগ্রাম কমিটি ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ পালনে যে কর্মসূচি ঘোষণা করে তাতেও ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া যায়। সকল শিক্ষায়তনে ধর্মঘট ও সভাসমাবেশের পাশাপাশি কোথাও কোথাও, যেমন নারায়ণগঞ্জে হরতাল, মিছিল যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এছাড়া সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে ৫ এপ্রিল ঢাকায় সফলভাবে পতাকা দিবস পালনের মধ্যদিয়ে কমিটির জন্য কিছু অর্থেরও ব্যবস্থা হয়।

সত্যই ১৯৫১ সালটা ছিল বিস্ফোরক বাহান্ন তথা একুশের জন্য প্রস্তুতিকাল। আর এ পর্বে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির কর্মতৎপরতা ছিল নানামাত্রায় বিকশিত। পতাকা দিবস, সভাসমাবেশ, মিছিল, স্মারকলিপি পেশ এসব তো ছিলই। কিন্তু এসব কিছু ছাড়িয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল সংগ্রাম কমিটির প্রচারিত একটি ইস্তাহার যেখানে ছিল বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত দাবি। অবশ্য ইস্তাহারের শিরোনাম ছিল 'স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠন করুন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি ১৯৫০ সালে ধীরেসুস্থে যেসব কার্যক্রম হাতে নেয় ১৯৫১ সাল নাগাদ তা একটি কার্যকর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভিৎ তৈরি

করে। এর পেছনে ছিল ঢাকার প্রধান ছাত্রাবাসগুলো, এককথায় সাধারণ ছাত্রসমাজ। সঙ্গে ছিল যুবলীগের তরুণ কর্মীরা। এ পর্যায়ে অন্যকোনো সংগঠনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায় নি। আটচল্লিশের স্থগিত আন্দোলন এভাবে নতুন করে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বলা যায় ভাষা-আন্দোলনের মরা গাঙে জোয়ারের সম্ভাবনা। এর জন্য দরকার ছিল একটি আগুনের ফুলকি যা প্রতিটি আন্দোলনে পাক শাসকগোষ্ঠীই সরবরাহ করেছে।

বাহান্ন তথা একুশের আন্দোলন

আটচল্লিশ থেকে বাহান্ন। আন্দোলনের জন্য পরিবেশ তৈরিই ছিল। শুকনো বারুদে আগুনের ফুলকি জুগিয়ে দিলেন তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন। সাতাশে জানুয়ারি (১৯৫২) ঢাকায় পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি জানালেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হতে যাচ্ছে, আর পাকিস্তান হবে একটি ইসলামি রাষ্ট্র।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি জিন্নাহ সাহেবের ভাষা-বিষয়ক মতামতের কথাও উল্লেখ করেন।

ছাত্রসমাজে এ বক্তৃতার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ২৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভা এবং ৩০ জানুয়ারি সব শিক্ষায়তনে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত। ওই ধর্মঘট উপলক্ষে ছাত্র এলাকায় বিশাল এক মিছিল বের হয় এবং তাতে জনসাধারণের যোগদান ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। সেদিনকার সভায় আন্দোলনে গতি সঞ্চার করতে ৪ ফেব্রুয়ারি শহরের সব শিক্ষায়তনে ধর্মঘট পালন ও সভাসমাবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মূলত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের উদ্যোগে ৩১ জানুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামিক ব্রাদারহুড প্রভৃতি সংগঠন ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, মিটফোর্ড স্কুল, জগন্নাথ কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সংগঠন ও ছাত্রাবাস থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ওই কর্মীসভায় ৪০ সদস্যের 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব।

আন্দোলনের সূচনা

প্রস্তাবিত ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সফল করতে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের বিশেষ তৎপরতা ছিল লক্ষ্য করার মতো। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ওই সভায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ও উদ্দীপক বক্তব্য আন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কিছুসংখ্যক নেতাকর্মীর বিরোধিতা সত্ত্বেও দশবারো হাজার ছাত্রছাত্রী ঠিকই মিছিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পথে নেমে আসে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে'র (বর্তমান বাংলা একাডেমীর মূল ভবন) সামনে রাস্তায় স্লোগান ওঠে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' 'আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না' ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে ঐদিনের সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, সভাসমাবেশ ও প্রতিবাদী মিছিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা। তাই ছাত্রদের মনে ছিল আইন পরিষদ ঘেরাও করার চিন্তা যাতে সদস্যগণ বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে সুপারিশ প্রস্তাব পাশ করতে বাধ্য হন। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদও একুশে ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি সফল করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায়। আহ্বান জানান মওলানা ভাসানী।

আন্দোলন ঠেকাতে ১৪৪ ধারা জারি

একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সফল করে তুলতে ছাত্রযুব সমাজের উদ্দীপনা ও তৎপরতা সম্ভবত সরকার ও তার প্রশাসনকে বিচলিত করেছিল। তাই তারা প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার মতোই আরেকটি অদূরদর্শী পদক্ষেপ নেয়। তারা ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে একমাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে সভাসমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

সেদিন বিকেলে প্রচারিত ঐ ঘোষণা ছাত্রসমাজে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ছাত্রাবাসগুলোতে উত্তেজিত ছাত্রদের জটলা ও বৈঠক ছিল দেখবার মতো। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে তাদের ঘোষণা: '১৪৪ ধারা মানি না, মানবো না'। ছাত্রমহলে এ উত্তাপ ছড়াতে কোনো দল বা সংগঠন এগিয়ে আসে নি, আসতেও হয় নি। এমনটাই ছিল রাজনীতি-সচেতন সাধারণ ছাত্রদের মনোভাব।

কিন্তু কিছুসংখ্যক ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক দল যে ১৪৪ ধারা অমান্য করার বিপক্ষে তা বোঝা গেল ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম

পরিষদের বৈঠকে তাদের ভূমিকায়। ঐ বৈঠকে যারা ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, খয়রাত হোসেন, কাজী গোলাম মাহবুব, এমনকি স্বয়ং বৈঠকের সভাপতি আবুল হাশিম।

অন্যদিকে ১৪৪ ধারা অমান্য করে একুশের কর্মসূচি পালনের পক্ষে ছিলেন মাত্র তিনজন (কারোমতো চারজন)– অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও গোলাম মাওলা। ১১/৩ ভোটে পরাজিত হয়েও ছাত্রনেতারা দাবি করেন যে সাধারণ ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে। তাই তারা এ ভোটাভুটির ফলাফল মানবে না। অনেক তর্কাতর্কির পর সিদ্ধান্ত হয়, পরদিনের ছাত্রসভার সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, যদি ঐ ছাত্রসভায় সংগ্রাম পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল হয় তাহলে সংগ্রাম পরিষদ স্বতঃসিদ্ধভাবে বিলুপ্ত বিবেচিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে যে বৃহৎ কর্মীসভায় সর্বসম্মতি ক্রমে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের শর্তসাপেক্ষ বিলুপ্তি ঘোষণার নীতিগত অধিকার কোনো বৈঠকের সভাপতির থাকতে পারে কি না।

আমতলায় ছাত্রসভা

একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ছাত্ররা দু'একজন করে বিশ্ববিদ্যালয় (তখনকার আর্টস বিল্ডিং বর্তমানের মেডিকেল হাসপাতাল এমারজেন্সি বিভাগ) প্রাঙ্গণে আসতে থাকে। বেলা বাড়তে অনেক ছাত্রছাত্রী এসে হাজির হয়। মধুর ক্যান্টিনের পাশে আমতলায় সভা শুরু হয়, সভাপতি গাজীউল হক। সর্বদলীয় পরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হক ১৪৪ ধারা অমান্যের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক সাজিয়ে বক্তৃতা করেন। তারপক্ষে সমর্থন বানান কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী প্রমুখ ছাত্রনেতা। কিন্তু উত্তেজিত ছাত্রদের প্রতিবাদে তার বক্তব্য মাঝপথে শেষ করতে হয়।

ছাত্রসাধারণের পক্ষে বক্তৃতা করেন আবদুল মতিন। তার বক্তব্য, ১৪৪ ধারা ভেঙে কর্মসূচি পালন করতে হবে, না হলে আর কখনো আন্দোলন সম্ভব হবে না। উপস্থিত ছাত্ররা একবাক্যে তাকে সমর্থন জানায়। এরপর আবদুস সামাদসহ দু'একজন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সিদ্ধান্ত হয় দশজন করে ছোট ছোট মিছিল করে পথে নামতে হবে, লক্ষ্য এসেম্বলি হল তথা পরিষদ ভবন। এরপর সভাপতির ঘোষণার মধ্যদিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার সূচনা। সঙ্গে সঙ্গেই স্লোগান ওঠে: 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'চলো, চলো, এসেম্বলি চলো'।

বাইরে রাস্তায় তখন খাকি হাফপ্যান্টপরা পুলিশবাহিনী প্রস্তুত– কেউ সশস্ত্র, কেউ লাঠি হাতে। পাশে ট্রাক, পিকআপ ভ্যান। সভাশেষে উত্তেজিত ছাত্রছাত্রীদের গেট পার হয়ে রাস্তায় নেমে ১৪৪ ধারা ভাঙার চেষ্টা, আর ক্রমাগত স্লোগান 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই'। অন্যদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে অবিরাম কাঁদানে গ্যাস বর্ষণ এবং পথে বেরিয়ে আসা ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ যাতে তারা পরিষদ ভবনের দিকে এগোতে না পারে। এর মধ্যেই অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করে ভ্যানে ও ট্রাকে তুলে নিয়েছে পুলিশ। আমতলা প্রাঙ্গণের বাতাস কাঁদানে গ্যাসে এমনই ঝাঁঝালো যে ছাত্ররা সেখানে দাঁড়াতে না পেরে নানা পথে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে জড়ো হতে শুরু করে। আমতলার সভায় উপস্থিত ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহিম, নার্গিস বেগম, সারা তৈফুর, শামসুন্নাহার এবং আরো অনেকে।

এবার মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে

সামনের রাজপথ, পেছনের রেললাইন, মেডিকেল হাসপাতালের ভাঙা পাঁচিল ধরে ছাত্ররা যে যেভাবে পারে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠির ঘা থেকে নিজদের বাঁচিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণ থেকে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে উপস্থিত। এবার চেষ্টা হোস্টেল থেকে পশ্চিম দিকে সামান্য দূরে অবস্থিত পরিষদ ভবনের সামনে পৌঁছানো। এরমধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পথচারী হোস্টেলের সামনে, বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের পশ্চিম কোণে জড়ো হয়েছে। কারণ ছাত্রদের ওপর পুলিশি হামলার খবর ইতোমধ্যে চারিদিকে পৌঁছে গেছে। পুলিশ বাহিনী এখন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে রাস্তার দখল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গড়ে তুলেছে শক্ত ব্যারিকেড।

তাদের লক্ষ্য ছাত্রদের পরিষদ ভবনের দিকে যেতে না দেওয়া। অন্যদিকে ছাত্রদের অবিরাম চেষ্টা ফুলার রোডের পশ্চিম প্রান্তে পরিষদ ভবনের সামনে জমায়েত হওয়া। পুলিশ থেকে থেকে টিয়ারগ্যাসের শেল ছুঁড়ছে রাস্তায় এবং হোস্টেল প্রাঙ্গণ লক্ষ্য করে, হাসপাতাল প্রাঙ্গণও বাদ যাচ্ছে না। আর হোস্টেল প্রাঙ্গণ থেকে স্লোগান উঠছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'পুলিশী জুলুম চলবে না' 'চলো চলো এসেম্বলি চলো'। এটা ছিল সশস্ত্র পুলিশ বনাম নিরস্ত্র ছাত্রদের তথাকথিত খণ্ডযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও সামনের রাস্তায়।

নিরস্ত্র ছাত্রজনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ

একুশে ফেব্রুয়ারি বেলা তিনটায় পূর্ববঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা। মন্ত্রী, পরিষদ সদস্য (এম.এল.এ)-দের অনেকেই হোস্টেলের সামনের রাস্তা দিয়ে পরিষদ ভবনে যাবেন। ছাত্ররা তাই চেষ্টা করেছে তাদের কারো কারো কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে যাতে তারা পরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সুপারিশ প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় সে চেষ্টা খুব একটা কাজে আসে নি।

নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সংগ্রামী ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সামনে পৌঁছাতে বারবার রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভাঙতে পারে নি। তবু তারা হাল ছাড়ে নি। পুলিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ তারা জারি রেখেছে। চলেছে সশস্ত্র পুলিশ বনাম নিরস্ত্র ছাত্রদের অদ্ভুত এক লড়াই।

লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ছাত্রদের প্রতিবাদ বন্ধ করতে পারছে না দেখে ক্রুদ্ধ পুলিশ প্রশাসন চরমপন্থার আশ্রয় নেয়। বিনা প্ররোচনায় এবং কোনো প্রকার হুঁশিয়ারি ঘোষণা ছাড়াই পুলিশবাহিনী হোস্টেল প্রাঙ্গণে ও রাস্তায় জমায়েত ছাত্র-জনতার দিকে তাক করে বেশ কয়েক দফা গুলি চালায়। সরকারি হিসাব মতে তখন বেলা ৩টা বেজে ২০ মিনিট, আর গুলি চলেছে ২৭ রাউন্ড। প্রশ্ন উঠতে পারে: গুলি চালানোর মতো পরিস্থিতি কি সৃষ্টি হয়েছিল? পুলিশ বা সরকার যাই বলুক পরিষদ ভবনের স্বাভাবিক পরিবেশ তো ঠিকই ছিল। আর পুলিশের ওপরও কোনো হামলা করে নি ছাত্ররা, তাহলে?

হতাহতের খতিয়ান

তবু পুলিশ আত্মরক্ষার মিথ্যা অজুহাতে গুলি চালিয়েছে। ওরা যে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে গুলি ছুঁড়েছে তার প্রমাণ মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকউদ্দিন। হোস্টেল প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো অবস্থায় তার মাথায় গুলি লাগে। একুশের প্রথম শহীদ রফিকউদ্দিন। দ্বিতীয় শহীদ গফরগাঁর (গ্রাম পাঁচুয়া) দেহাতি যুবা আবদুল জব্বার। তার তলপেটে গুলি লাগে, পরনের লুঙ্গি পুরোপুরি রক্তে ভিজে যায়। হাসপাতাল এমারজেন্সিতে নেওয়ার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত ঊরুতে গুলিবিদ্ধ হন। অস্ত্রোপচার করেও তাকে বাঁচানো যায় নি। আর পায়ে গুলিবিদ্ধ সরকারি কর্মচারি আবদুস সালামকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তার মৃত্যু ৭ এপ্রিল (১৯৫২)।

হোস্টেলের বাইরে রাস্তায় পুলিশের গুলিতে অন্ততপক্ষে এক কিশোর ও এক যুবক শহীদ হন। দৈনিক 'আজাদ'-এ পরিবেশিত খবরে (২২.২.'৫২) প্রকাশ, ফুলার রোডে গুলিবিদ্ধ এক কিশোরের লাশ পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। আর মাদ্রাসাছাত্র লোকমান আহমদ আমিনীর সাক্ষ্যে জানা যায় রাস্তার কোনায় গুলিতে নিহত এক যুবকের কথা। এলিস কমিশনের রিপোর্টেও খেলার মাঠের কোণায় গুলিতে এক যুবকের মৃত্যুর তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ছয়। আহত হন অনেকে।

গুলিবর্ষণের প্রতিক্রিয়া

গুলিবর্ষণে ছাত্র-অছাত্র হত্যার প্রতিক্রিয়া ছিল অভাবিত। এ খবর দ্রুত ছড়ানোর অন্যতম কারণ ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের স্থাপিত 'কন্ট্রোল রুমে'র মাইকে প্রচার। দুপুরেই হোস্টেলের বিশ নম্বর শেডের ১ নম্বর কক্ষে মেডিকেল ছাত্রদের চেষ্টায় স্থাপিত হয় মাইক-সজ্জিত কন্ট্রোলরুম, উদ্দেশ্য আন্দোলনের সাহায্যে প্রচার। দুপুর থেকেই মাইকে আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চলেছে।

গুলিবর্ষণের পর মাইকে সরকার-বিরোধী শ্লোগান ও বক্তৃতায় আগুন ঝরেছে। পরবর্তী সময়ে মাইকে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। পথচারী মানুষ তা শুনেছে এবং অন্যদের তা জানিয়েছে। মুখে মুখে বার্তা রটে গেছে শহরময়। হতে পারে মাইকে প্রচারের কল্যাণে পরিষদ ভবনে গুলিবর্ষণ ও হতাহতের খবর দ্রুত পৌঁছে যায়।

পুলিশের গুলিতে ছাত্রহত্যার ঘটনা পুরান ঢাকাবাসীদের বিচলিত করে। এর আগে তারা ভাষা-আন্দোলন সমর্থন করে নি। এবার তারাই দলে দলে হোস্টেল প্রাঙ্গণে ও হাসপাতালে এসে ভিড় জমায়। শহীদদের এবং আহতদের এক নজর দেখবে বলে। তারা শোকে কাতর এবং সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ। অন্যদিকে পরিষদ ভবনে কংগ্রেস-দলীয় সদস্যদের পাশাপাশি সরকারি দলের বেশ কয়েকজন সদস্য ছাত্র হত্যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে দায়ী করেন। তাকে ঘটনাস্থলে যেতে অনুরোধ জানান, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে অনড়। তিনি সেখানে যেতে নারাজ।

প্রতিবাদে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, শামসুদ্দিন আহমদ, আনোয়ারা খাতুন, মনোরঞ্জন ধর, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরিষদ সদস্য অধিবেশন বর্জন করে ঘটনাস্থল মেডিকেল হোস্টেলে চলে আসেন। সব

কিছু ঘুরে ফিরে দেখেন। সেখান থেকে হাসপাতালে। এর মধ্যে জনাব তর্কবাগীশ কন্ট্রোল রুমের মাইকে পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে আবেগ ঝরানো ভাষণ দেন। পরিষদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান, ঘটনার প্রতিবাদে পরিষদ ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে।

ছাত্রহত্যার ঘটনা জনমনে এতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যে মানুষ দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে ১৪৪ ধারার মৃত্যু ঘটিয়েছে, রাতের কার্ফ্যু অমান্য করেছে, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ অগ্রাহ্য করেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো ছাত্র-জনতার একাত্মতা। যে কারণে একুশের বিকেল থেকে ছাত্রএলাকা মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। অবস্থাদৃষ্টে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের যারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন তারাও আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু মেডিকেল হোস্টেলে যাতায়াত শুরু করেন, ভুলে যান সর্বদলীয় পরিষদের বিলুপ্তির কথা।

গুলিবর্ষণের প্রতিক্রিয়া শুধু ঢাকা শহরে নয় গোটা প্রদেশে ব্যাপক আন্দোলনের জন্ম দেয়। যেন এক জাদুমন্ত্রে দেশের সর্বত্র মানুষ রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়ে পথে নামে। সভা সমাবেশ মিছিল আর স্লোগান ভাষিক সংকল্পের প্রকাশ ঘটায়। ছাত্র সমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, রাজনৈতিক নেতারা অগ্রণীদের পথ ধরে হেঁটেছে এবং আন্দোলনকে জনতার সান্নিধ্যে পৌঁছে দিয়েছে।

২২ ফেব্রুয়ারি গণআন্দোলনের সূচনা

গুলিবর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনায় পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ভি.পি. গোলাম মাওলার কক্ষে বৈঠক বসে। অলি আহাদ, আবদুল মতিন, ইমাদুল্লাহ্ ও জাহেদীসহ ছাত্রনেতাদের উপস্থিতিতে গোলাম মাওলাকে সর্বদলীয় পরিষদের অস্থায়ী আহ্বায়ক মনোনীত করে মেডিকেল হোস্টেলকে কেন্দ্র করে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ বৈঠক বসে ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে। ঠিক হয় পরদিন হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জানাজা শেষে তাদের লাশ নিয়ে মিছিল করা হবে।

কিন্তু মধ্যরাতে পুলিশ হাসপাতাল থেকে শহীদ রফিকউদ্দিন ও আবদুল জব্বারের লাশ তুলে নিয়ে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়। সকালে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা ও শোকসভার আয়োজন। শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন যুবনেতা ইমাদুল্লাহ্। জানাজা ও শোকসভায় বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছাত্রজনতা মিছিল করে হোস্টেল প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে পড়েন। কার্জন

হল ও হাইকোর্টের পাশ দিয়ে মিছিল যতই এগিয়েছে ক্রমেই তার আয়তন বেড়েছে। লোকজন আবেগের তাড়নায় মিছিলে শরিক হয়েছে, এমনকি যোগ দিয়েছে সরকারি কর্মচারিদেরও অনেকে। নির্বিচার লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস তাদের দমাতে পারে নি।

রফিক জব্বার বরকত তাদের জীবনের বিনিময়ে ছাত্র আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত হতে সাহায্য করেছিলেন। এরপরও ঘটেছে আরো মৃত্যু যা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মনে সাহস ও শক্তি জুগিয়েছে। বাইশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা হয়ে ওঠে মিছিলের শহর, লাল-কালোয় প্রতিবাদ ও শোকের শহর। শহীদদের রক্তমাখা কাপড়বাঁধা বাঁশের লাঠি এবং লালবর্ণমালায় লেখা ফেস্টুন উঁচিয়ে প্রতিবাদী মিছিল দিনভর শহরের পথে পথে ঘুরেছে।

ক্রুদ্ধ, শোকার্ত মিছিলে স্লোগান উঠেছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' 'খুনি নুরুল আমিনের বিচার চাই' ইত্যাদি। সেই সঙ্গে নতুন স্লোগান: 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক।' তা ছাড়া ছিল শুরু থেকে উচ্চারিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান: 'সর্বস্তরে বাংলা চালু কর'। সেদিনের মিছিলে ছাত্রদের তুলনায় ঢাকাই আমজনতার সংখ্যা ছিল অনেক অনেক বেশি, তাদের অধিকাংশই কিশোর, তরুণ, যুবক, কিছু সংখ্যক মধ্যবয়সী মানুষ।

বাইশে ফেব্রুয়ারি সত্যকার অর্থেই ছিল হরতাল, মিছিল আর 'চাকা বন্ধ' করা একটি আশ্চর্য দিন। কোনো সংগঠনের ডাকে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষ ঘর থেকে, কর্মস্থল থেকে পথে নেমেছে। একইভাবে দোকানপাট, বাজারঘাট পুরোপুরি বন্ধ থেকেছে। অফিস, আদালতেও একই অবস্থা, এমনকি ঢাকা রেলস্টেশনেও ট্রেনের চাকা বন্ধ। সরকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় শহরের রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনী (ই.পি.আর) মোতায়েন করে। তাতেও মিছিলের পথ চলা বন্ধ হয় নি। এদিন গুলিতে শহীদ হন হাইকোর্টের কর্মচারি সফিউর রহমান, রিকশাচালক আবদুল আউয়াল, কিশোর ওহিউল্লাহ (সরকারি নথিতে নাম ওহিদুল্লাহ), তাঁতীবাজারের যুবক সিরাজউদ্দিন এবং আরো কয়েকজন যাদের পুলিশ ও সেনাজওয়ানদের গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়।

সেদিন শুক্রবার। মসজিদে, মসজিদে শহীদদের জন্য মুনাজাত পড়া হয়। শহরের বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উড়ছে। রাস্তায় মানুষের হাতে বাঁধা শোকের প্রতীক কালো ফিতা, কিংবা বুকে আঁটা কালো ব্যাজ। ক্রুদ্ধ ঢাকাই

যুবকদের তৎপরতায় কুখ্যাত 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার ছাপাখানা জুবিলী প্রেস পুড়ে ছাই। আন্দোলন-বিরোধী পত্রিকা 'সংবাদ' ও 'মর্নিং নিউজ'-এ হামলার মত একাধিক ঘটনা সরকারকে বুঝিয়ে দেয় নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়ে সরকার কত বড় অন্যায় কাজ করেছে।

শুধু শহর ঢাকাতেই নয়, গণআন্দোলনের আগুন ২২ তারিখ থেকেই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষায়তনগুলোতেও ধর্মঘট, সভা, মিছিল জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে। পরিস্থিতি এত দ্রুত সংকটজনক হয়ে ওঠে যে বিচলিত সরকার তড়িঘড়ি আইন পরিষদে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সুপারিশ প্রস্তাব পাশ করে। সুপারিশ গণপরিষদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এটা যে আন্দোলন বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রীর এক চাল তার প্রমাণ মেলে পরবর্তী সময়ে গণপরিষদের অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীসহ মুসলিম লীগ-দলীয় সদস্যদের বাংলা বিরোধিতা। যে কারণে গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর কূটকৌশল সত্ত্বেও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সংসদীয় দলে ভাঙন দেখা দেয়। বাইশে ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, পরদিন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, এরপর শামসুদ্দিন আহমদসহ আরো কয়েকজন। একাধিক জেলায় মূল দলেও ভাঙন দেখা দেয়। অন্যদিকে জনগণের মধ্যে সরকার-বিরোধী মনোভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে।

শহীদ মিনার প্রাণের মিনার

'শহীদস্মৃতি অমর হোক'– এ স্লোগান ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শহীদ স্মৃতি অমর করে রাখতেই প্রথম শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ এবং এর ধারাবাহিকতায় নির্মিত জাতীয় শহীদ মিনার কালজয়ী মর্যাদা পেয়েছে। এ স্লোগানের প্রেরণাতেই ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিকেল হোস্টেলের রাজনীতি-সচেতন ছাত্রদের চেষ্টায় ও শ্রমে তৈরি হয় ১০ ফুট উঁচু ও ৬ ফুট চওড়া ছোটখাট একটি স্থাপত্যকর্ম, নাম 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'। তাৎক্ষণিক উদ্যোগে তৈরি এ স্মৃতিস্তম্ভের নকশা আঁকেন মেডিকেল ছাত্র বদরুল আলম। স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে সাঁটা ফলকটিও বদরুল আলমের হাতে লেখা। ২৩ তারিখ রাতেই এর কাজ শেষ হয়। এ কাজে ইট, বালি, সিমেন্ট জুগিয়ে ছিলেন ঠিকেদার পিয়ারু সরদার।

২৪ ফেব্রুয়ারি রোববার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন বয়সী মানুষজন ছুটে আসতে থাকেন শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে। তাদের

মুখেই 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' শহীদ মিনার নামে পরিচিত হয়ে যায়। শহীদ মিনারের বেদীতে রাখা ফুল, টাকাপয়সা, এমনকি অলংকার মানুষের আবেগ ও শ্রদ্ধার প্রতীক হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। তাই ২৬ ফেব্রুয়ারি আবুল কালাম শামসুদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনার উদ্বোধনের পর সেদিনই শেষবিকালে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী শহীদ মিনার ভেঙে ফেলে। ইটের শেষ টুকরাটিও তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু শহীদ মিনার মানুষের প্রাণের মিনার বলেই স্মৃতির মিনার হয়ে বেঁচে থাকে। ১৯৫৬ সাল থেকে ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় শহীদ মিনার ঠিকই স্থায়িত্ব অর্জন করে।

প্রথম শহীদ মিনারের কাছাকাছি স্থানে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও নভেরা আহমদের ভাস্কর্যের ভিত্তিতে তৈরি পরিকল্পনা অনেকটা কাটছাট করে গড়ে তোলা হয় বর্তমান শহীদ মিনার। শহীদ মিনার হয়ে ওঠে গণতান্ত্রিক চেতনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রেরণা। দুঃখের বিষয় প্রস্তাবিত মূল শহীদ মিনার স্বাধীন বাংলাদেশেও তৈরি হয় নি। শোনা যায় মূল নকশাও নাকি হারিয়ে গেছে। ভাষা-আন্দোলন নিয়ে সরকারপক্ষে এ ছিল অবহেলার চরম প্রকাশ।

আরো কিছু ঘটনা

তেইশে ফেব্রুয়ারি থেকেও হরতালের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, রাজপথে মিছিলের পদযাত্রার স্লোগান সব কিছুই একই ভাবে চলেছে। যেমন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় তেমনি দেশের অন্যত্র। ঢাকার বাইরে কোনো কোনো শহরে আন্দোলনের তীব্রতা ঢাকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ঢাকায় আন্দোলন অব্যাহত থাকে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ছুটির দিনেও। এ আন্দোলনের প্রভাব তাৎক্ষণিক ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদীয় রাজনীতিতে কিছুটা হলেও পড়েছিল। সেখানকার গণতন্ত্রী ও প্রগতিবাদী কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গড়ার উদ্যোগ নেন।

ঢাকায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণে ছাত্রজনতার হত্যার বিরুদ্ধে খবর ছাপে পশ্চিম পাকিস্তানের নামীদামী পত্রিকা 'ডন' 'ইভনিং টাইমস' 'খাইবার মেইল'। একুশের আন্দোলন রক্তের বিনিময়ে ও লক্ষ্য অর্জনের আন্তরিকতায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে আন্দোলন যেমন ঢাকায় তেমনি পূর্ববাংলার প্রতিটি শহরে, এবং শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষায়তনগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাতে ছিল জনগণের সমর্থন।

সরকারের দ্বিমুখী নীতির চতুরতা

সরকারের উপর আন্দোলনের চাপ কমিয়ে আনতে নুরুল আমিন প্রশাসন চতুর কূটনীতির আশ্রয় নেয়। তাছাড়া মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গুলিবর্ষণে নিহতদের উদ্দেশে গভীর শোকপ্রকাশ, অপরাধীদের শাস্তি বিধান ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনুরূপ প্রস্তাব নেওয়া হয় মুসলিম লীগের সংসদীয় কমিটির বৈঠকেও। জনসাধারণের সরকার-বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করেই মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ও তার প্রশাসন এ ধরনের কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়।

আবার একই সঙ্গে ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রচারিত মুখ্যমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতায় ছিল বিপরীত সুর, ছিল মিথ্যার বেসাতি। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তিনি পুলিশের পক্ষ নিয়ে কথা বলেন এবং সব অঘটনের দায় আন্দোলনকারীদের ওপর চাপিয়ে দেন। এমনকি আন্দোলনের প্রেরণা বাইরে থেকে অর্থাৎ ভারত থেকে এসেছে এমন মিথ্যা বলতেও তার বাধে নি। যেকোনো সরকার-বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তোলা ছিল পাকিস্তানি শাসকদের বরাবরের অভ্যাস যা তাদের রাজনৈতিক কূটকৌশলের মধ্যে পড়ে। জিন্নাহ-লিয়াকত আলী থেকে নাজিমুদ্দিন-নুরুল আমিন কেউ এদিক থেকে ব্যতিক্রম নন।

এমনই এক স্ববিরোধী আচরণের মধ্য দিয়ে নুরুল আমিন সরকার আন্দোলন স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছে এবং তা চরম দমননীতির মাধ্যমে। আর জবাবদিহির দায় এড়াতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ২৫ ফেব্রুয়ারি আইনসভার অধিবেশন স্থগিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতায় পরিবেশিত মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ জানায় সংগ্রাম পরিষদ। কিন্তু এটা সত্য যে তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ কর্মতৎপরতায় মতভেদ আন্দোলনে প্রভাব ফেলে। তাছাড়া টানা ৫ দিনের স্বতঃস্ফূর্ত সফল হরতালের পর জনস্বার্থভিত্তিক নতুন কর্মসূচি দিতে না পারা ইত্যাদি নানা কারণে সুবিধাবাদী মহল, এমনকি দৈনিক 'আজাদ'ও ক্রমে ভোল পাল্টাতে শুরু করে। তবু ২৫ ফেব্রুয়ারিতেও সর্বাত্মক হরতাল ও বিক্ষোভ, মিছিল ঠিকই চলেছে। তবে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ২৬ তারিখ থেকে হরতাল স্থগিত করা হয়, কিন্তু শিক্ষায়তনে ধর্মঘট অব্যাহত থাকে।

দমননীতির চরম প্রকাশ

বাইশে ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী মেডিকেল হোস্টেলে ঢুকে কন্ট্রোল রুম তছনছ করে মাইক স্পিকার কেড়ে নিয়েছিল। কারণ সেখানকার প্রচার জনগণকে ব্যাপক ভাবে উদ্দীপ্ত করছিল। এরপর প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছে সলিমুল্লাহ হল এবং ফজলুল হক হল ও জগন্নাথ কলেজের প্রচারযন্ত্র। পুলিশ ২৫ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালায় এবং শেষোক্ত প্রচারযন্ত্র দুটো ছিনিয়ে নেয়, কিন্তু সেদিন তারা সলিমুল্লাহ হলে ঢুকতে পারে নি। তবে চলেছে ব্যাপক হারে গ্রেফতার। রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, ছাত্রনেতাকর্মী কেউ বাদ যায় নি।

প্রকৃতপক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে দেখা যায় সরকারি দমননীতির নগ্ন প্রকাশ। ঐ দিন দুপুরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সলিমুল্লাহ হল ঘেরাও করে হাউস টিউটর ড. মফিজউদ্দিনসহ ৩০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। বিকেলে শহীদ মিনার ভেঙে ফেলার কথা আগেই বলা হয়েছে। সাতাশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের হল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। দমননীতির পাশাপাশি সরকার অপপ্রচারে নামে। সরকারি প্রেসে ছাপা লক্ষাধিক ইস্তাহার বিলি করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। ইস্তাহারের মূল কথা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নামে ভারতীয় প্ররোচনায় সন্ত্রাসবাদী, কমিউনিস্ট ও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতারা পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যকলাপ লিপ্ত। কাজেই পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

দমননীতি সত্ত্বেও অন্যত্র আন্দোলন অব্যাহত

সরকারের মিথ্যা প্রচার ও দমননীতির মধ্যেও ঢাকায় তখনো আন্দোলন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় নি। এর মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা অভয়দাস লেনে নানাবয়সী মহিলাদের প্রতিবাদ সভা (২৬ ফেব্রুয়ারি)। সভায় বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। অন্যদিকে ঢাকার বাইরে আন্দোলন তখনো যথারীতি চলেছে। জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায় নি। নারায়ণগঞ্জের ঘটনা তার একটি উদাহরণ। শুরু থেকেই নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনের তীব্রতা ছিল অনেকটা ঢাকার মতো। ২৯ ফেব্রুয়ারি মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগমকে অকারণে গ্রেফতার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাষাড়ায় পুলিশ-জনতার সংঘর্ষ

শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ঢাকা থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশবাহিনী এনে মমতাজ বেগমকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকার অপপ্রচারের পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জে পুলিশ হত্যার মতো ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার দায় আন্দোলনের ওপর চাপিয়ে দেয়। অন্যদিকে ঢাকায় ছাত্রযুবনেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি এবং ৯ মার্চ শান্তিনগরে বৈঠককালে তাদের গ্রেফতারের ফলে ঢাকায় আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়। তবে দেশের অন্যত্র আন্দোলন তখনো যে পূর্ণ উদ্যমে চলেছে তা আগেই বলা হয়েছে।

একুশে-পরবর্তী তৎপরতা

একুশের আন্দোলনে বিরতি ঘটে সরকারের চরম দমননীতি, অপপ্রচার ও মূল নেতাদের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে নতুন 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। নবগঠিত পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে ২৭ এপ্রিল (১৯৫২) ভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা, মহকুমা থেকে কয়েক'শ প্রতিনিধি এতে যোগ দেন।

এই সম্মেলনে গৃহীত ২২ দফা প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাসহ বাংলা রাষ্ট্র ভাষার দাবি অর্জনের পক্ষে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। বাহান্নর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে রয়েছে ২০ নভেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগের এবং ৫ ডিসেম্বর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভা। উভয় সভাতেই বাংলা রাষ্ট্র ভাষা এবং শেষোক্তটিতে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। ডিসেম্বরের ৫ তারিখে দেশব্যাপী বিপুল উদ্দীপনায় বন্দিমুক্তি দিবস পালিত হয়। কারণ ভাষা-আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীসহ রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই তখনো জেলে।

একুশের উত্তর-প্রভাব

এক পর্যায়ে এসে স্বাভাবিক নিয়মে একুশের ভাষা-আন্দোলনের অবসান ঘটে যদিও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি তখনো অর্জিত হয় নি। কিন্তু এ আন্দোলন সমাজে দু'দিক থেকে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়– যেমন সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চায় তেমনি রাজনীতিতে। রাজনীতির পরিবর্তন অস্থায়ী হলেও সেখানে এর প্রভাব নিঃশব্দে কাজ করে গেছে। যেমনটা দেখা গেছে পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের দশকে।

১৯৫২ সালেরই ২৭ এপ্রিল ঢাকায় ভাষা-আন্দোলনের বিচারব্যাখ্যায় যে কর্মী মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ব্যাপক সমারোহে, তাতে ছাত্রজনতার আবেগ-প্রধান সাড়া প্রকাশ পায় যদিও ভাষা-আন্দোলনের অধিকাংশ নেতাকর্মী তখনো জেলে আটক। এ সমাবেশ অনুষ্ঠানে উদ্যোগ ও বিশেষ ভূমিকা ছিল আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা এবং ঢাকার ছাত্র সমাজের।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কর্মী সম্মেলন শেষ হয়। এর জোয়ারি প্রভাব সমাজের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে পরিবর্তিত সুস্থ মূল্যবোধের সূচনা ঘটায় তা ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ধারার। অংশত তা প্রগতিশীলতারও। কমিউনিস্ট পার্টি তার সীমিত সাংগঠনিক শক্তির কারণে এ রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে নি। তারা সরকারের চরম দমননীতির কারণে আওয়ামী লীগের সঙ্গে চলেছে। সমাজে ব্যাপক হারে কমিউনিস্ট মতাদর্শ সমর্থনের মতো পরিবেশ তখনো পুরোপুরি সৃষ্টি হয় নি, যা ছিল তা মূলত আংশিক।

কিন্তু ছাত্রসমাজে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মতাদর্শের দিকে ঝোঁক ক্রমাগত বেড়েছে। কমিউনিস্টদের দূরদর্শী উদ্যোগে গঠিত ছাত্রসংগঠন 'ছাত্র ইউনিয়ন' গোটা প্রদেশে অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সংগঠনে গণতন্ত্রীদের তুলনায় প্রগতিবাদীদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ক্রমে এটি কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠনের চরিত্র অর্জন করে যেমনটি ছিল একসময়কার ছাত্র ফেডারেশন।

পাশাপাশি একই ধারায় কমিউনিস্ট পার্টি গণতন্ত্রী দল নামে একটি গণসংগঠন গঠন করলেও সমাজ থেকে এর পক্ষে রাজনৈতিক সাড়া ব্যাপকভাবে দেখা যায় নি। সমাজ তখনো কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণের মতো মানসিক উদারতা ও পরিপূর্ণ মানসিক অসাম্প্রদায়িকতা অর্জন করে নি। সেজন্য এবং সুযোগ্য শীর্ষ নেতৃত্বের অভাবে গণতন্ত্রী দল আওয়ামী লীগের মতো সামাজিক সমর্থন লাভ করতে পারে নি। হয়ে ওঠেনি দ্বিতীয় গণসংগঠন।

অবশ্য আওয়ামী মুসলিম লীগও ষাটের দশকের আগে ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি পায় নি। ভাষা-আন্দোলন রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজে রক্ষণশীলতার অচলায়তন ভাঙার সূচনা ঘটায়। ক্রমে সেই ধারার বিস্তার। এই ভাঙনের চরিত্রই প্রকাশ পায় ১৯৫৪ সালের শুরুতে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ধসনামা বিজয়ে এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অভাবিত ব্যাপক পরাজয়ে। কিন্তু সমরতন্ত্রী চরিত্রের কেন্দ্রীয় শাসকশ্রেণি পূর্ববঙ্গে তাদের এই পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয় মেনে নেয় নি। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গে

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন ঘটায় (১৯৫৪-এর ৩০ মে)। জারি করে ৯২-ক ধারার কেন্দ্রীয় রাজনীতির গভর্নরি শাসন ব্যবস্থা।

তবে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভাষা-আন্দোলন তথা একুশের উত্তরপ্রভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে প্রতি বছর উদযাপন জাতীয় চেতনার ভাষিক গণতান্ত্রিক চরিত্রে নাড়া দিয়েছে, প্রতিবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে শহীদ মিনারের থেকেছে বিশেষ ভূমিকা। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিকেলে বিশাল জনসভা গণতন্ত্রী ও প্রগতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। শহীদ দিবস সামরিক শাসনের রক্তচক্ষুকেও উপেক্ষা করার সাহস জুগিয়েছে।

অবশ্য সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এ প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এ প্রভাব পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যচর্চাকে পাকিস্তানি সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। শুরু হয়েছে নতুন ধারার সেক্যুলার ও প্রগতিবাদী সাহিত্যসৃষ্টির চর্চা। এর প্রমাণ মেলে ১৯৫২ সালেরই আগস্ট মাসে কুমিল্লা শহরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে। এ সম্মেলনের নানামাত্রিক অনুষ্ঠানে প্রগতিচেতনার বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। যেমন দেখা যায় সঙ্গীতে, মঞ্চনাটকে, আলোচনায় এমনকি লোকসংস্কৃতির প্রকাশে (যেমন কবিগান 'যুদ্ধ ও শান্তি'তে)।

এরই ধারাবাহিকতা প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত আবেগদীপ্ত, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে এবং ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসংস্কৃতি সম্মেলনে। শেষোক্ত সম্মেলনটি ছিল অধিকতর আন্তর্জাতিক চরিত্রের। এক্ষেত্রে ছিল প্রকট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি একুশে-প্রভাবিত সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রগতিশীল চেতনা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রকাশ ঘটেছিল। তা যেমন আলোচনায়, গানে ও নাটকে, তেমনি লোকসংস্কৃতির পরিবেশনে ছিল সুস্পষ্ট আধুনিক ভাবধারার প্রকাশ, সেই সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক উদার চেতনার। গানে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও ইকবাল প্রাধান্য পেয়েছিল। টাঙ্গাইল থেকে কাগমারি পর্যন্ত নির্মিত তোরণগুলোর নামকরণেও অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল।

ভাষা-আন্দোলন ভাষিক জাতীয়তাবাদের চরিত্র লালন করা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এ আন্দোলন প্রগতিবাদী চেতনা সংহত করতে সাহায্য করেছিল, সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা। কথাটি কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক শোনালেও এর সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। কাগমারি সম্মেলনে এর সর্বোত্তম প্রকাশ। আর

এই টানেই কিনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামরিক চুক্তির বিরোধিতায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে ভাঙন দেখা গেল। এ ভাঙন ছিল মতাদর্শগত চরিত্রের— সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে-বিপক্ষে।

ভাষা-আন্দোলন তথা একুশের আন্তর্জাতিক প্রকাশ ঘটেছে দিনটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে। অর্থাৎ দিনটিকে ইউনেস্কো কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতিদানে। এসবই একুশের ইতিবাচক উত্তরপ্রভাব। এ প্রভাব রাজনীতিকরা টেনে নিয়েছেন ষাটের দশকের সেক্যুলার জাতীয়তাবাদে এবং একাত্তরের রণাঙ্গনে।

কিন্তু একুশের নেতিবাচক রাজনৈতিক দিক হলো বামপন্থীদের পক্ষে ভাষিক জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব বুঝতে না পারা এবং জনসমর্থন তৈরি করে শাসনক্ষমতা হাতে নিতে না পারা। ক্ষমতাদখলের বিষয়টি মাথায় না রাখা। অবশ্য প্রসঙ্গত কমিউনিস্ট পার্টি ও তার অঙ্গসংগঠনের সীমাবদ্ধতার দিকটিও মনে রাখতে হবে।

এমন সব কারণে ক্ষমতা চলে যায় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের মতো সংগঠনের হাতে। আর সে কারণেই উচ্চশিক্ষা ও উচ্চ আদালতে দীর্ঘকাল পরও মাতৃভাষা বাংলা মাধ্যম প্রচলিত হয় নি। বাংলাদেশ নামেই ভাষিক জাতিরাষ্ট্র। মাতৃভাষা বাংলা শুধু সংবিধানে ঠাঁই নিয়ে তার রাজনৈতিক কর্তব্য শেষ করেছে। কবে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ঔপনিবেশিক রাজভাষাকে সরিয়ে আপন স্থানটি দখল করে তা বলা কঠিন।

সহায়কগ্রন্থ:

১. বদরুদ্দীন উমর, 'পূর্ব বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', (তিন খণ্ড), মাওলা ব্রাদার্স
২. বশীর আল হেলাল, 'ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস', বাংলা একাডেমি
৩. বদরুদ্দীন উমর, 'ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল', বাংলা একাডেমি
৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (প্রথম খণ্ড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়।
৫. একুশের সংকলন, স্মৃতিচারণ, ১৯৮০, বাংলা একাডেমি
৬. রতন লাল চক্রবর্তী, 'ভাষা-আন্দোলন: দলিলপত্র', বাংলা একাডেমি
৭. আহমদ রফিক ও আবদুল মতিন, 'ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য, সাহিত্য প্রকাশ
৮. আহমদ রফিক, 'ভাষা-আন্দোলন: ইতিহাস ও উত্তর প্রভাব'; সময় প্রকাশন
৯. আহমদ রফিক ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত সংকলন 'ভাষা-আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর', মাওলা ব্রাদার্স
১০. তসিকুল ইসলাম, 'বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা-আন্দোলন,' বাংলা একাডেমি
১১. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, 'ভাষা-আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস', বাংলা একাডেমি
১২. মামুন সিদ্দিকী, 'কুমিল্লায় ভাষা-আন্দোলন,' প্রকাশক-মাসুম মাজহার
১৩. আবদুল হক, 'ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব', মুক্তধারা
১৪. রফিকুল ইসলাম, 'ভাষা-আন্দোলন ও শহীদ মিনার', রোখসানা সুলতানা, আনন্দ
১৫. আবদুল মতিন, 'ভাষা ও একুশের আন্দোলন'
১৬. সুকুমার বিশ্বাস, 'বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন: কলকাতার সংবাদপত্র' বাংলা একাডেমি

ভাষা-আন্দোলনে
তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা

তমদ্দুন মজলিসের মতাদর্শ ও ভাষিক তৎপরতা

শুরুতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঠিক পর পরই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে যে কয়টি সংগঠন সোচ্চার হয়ে ওঠে তার মধ্যে তমদ্দুন মজলিস বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। অধ্যাপক আবুল কাসেম লিখেছেন যে, বন্ধুস্থানীয় কয়েকজন অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন করেন। এতে অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া, শামসুল আলম, সানাউল্লাহ নূরী প্রমুখ যোগ দেন ('একুশের সংকলন: স্মৃতিচারণ,' ১৯৮০, বাংলা একাডেমি)। একই সংকলনে লিখিত স্মৃতিচারণে অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া জানিয়েছেন যে তিনি ঐ সংগঠনের সংস্কৃতি সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরো কয়েকজন মজলিস সদস্যের নাম উল্লেখ করেছেন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি ও পূর্ববঙ্গে বাংলার ব্যবহার বাস্তবায়নে আগ্রহী তমদ্দুন মজলিসের মতাদর্শগত লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানে ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে ইসলামি চিন্তাবিদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বা মজলিসের সক্রিয় সদস্য শাহেদ আলী থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী মোহাম্মদ তোয়াহা একই কথা বলেছেন। মজলিসের ভাষিক তৎপরতার মধ্যেও মতাদর্শগত দিকটি যে সংগঠনের শীর্ষনেতাদের চেতনায় গভীরভাবে উপস্থিত ছিল তাদের বিভিন্ন বক্তব্যে ও কর্মকাণ্ডে তার প্রমাণ মেলে।

তমদ্দুন মজলিসের ভাষাবিষয়ক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' এই শিরোনামে ১৫ সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) তাদের প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়। তাতে বলা হয় 'বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, অফিস আদালতের ভাষা এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে ভাষা হবে দু'টি– বাংলা ও উর্দু।...পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা।... ইংরেজি হবে পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা' (একুশের সংকলন', প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩)।

বাংলা ভাষার অধিকার সম্পর্কে উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যের পর জনাব কাসেম ঐ পুস্তিকায় লাহোর প্রস্তাবের সূত্র ধরে পূর্ববঙ্গে বাংলা প্রচলন প্রসঙ্গে লেখেন 'কায়েদে আজম জিন্নাহ প্রত্যেক প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন' (প্রাগুক্ত সংকলন)। এ বক্তব্য মোটেই ঠিক নয়। জিন্নাহ-লিয়াকত থেকে খাজা নাজিমউদ্দিন সবাই প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তো দূরের কথা। মূল লাহোর প্রস্তাবের গোড়া কেটেছেন তো স্বয়ং জিন্নাহ সাহেব। তিনি পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

স্মৃতিচারণে পূর্বোক্ত পুস্তিকা সম্বন্ধে অধ্যাপক কাসেম লিখেছেনঃ 'এই বইয়ের লেখক ছিলাম আমরা তিনজন– অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, 'ইত্তেহাদ' সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ ও আমি নিজে। প্রবন্ধগুলিতে নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা হয়– বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত।'

এ পুস্তিকায় প্রকাশিত আবুল মনসুর আহমদের ছোট নিবন্ধটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এসেছে এভাবেঃ 'উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি অশিক্ষিত ও সরকারি চাকুরির অযোগ্য হইয়া যাইবেন।' এ ধরনের আশংকা বিভাগপূর্বকালে প্রকাশিত জনাব আবদুল হকের প্রবন্ধেও দেখা গেছে। ভাষিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এমনটাই ছিল স্বাভাবিক। অথচ বশীর আল হেলাল লিখেছেন যে ভাষা-আন্দোলনের জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ছিল না।

প্রসঙ্গত তমদ্দুন মজলিসের পূর্বোক্ত মতাদর্শগত প্রশ্নে তাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়টা স্পষ্ট হওয়া দরকার। এ বিষয়ে বশীর আল হেলাল লিখেছেনঃ '১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা বা দেশবিভাগের পরেপরেই ২রা সেপ্টেম্বর যে ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস।...চল্লিশের দশকের কলকাতার রেনেসাঁ সোসাইটির আদর্শ অনুযায়ী তমদ্দুন মজলিস ও 'সৈনিক' পত্রিকা প্রবর্তিত হয়েছিল... তারা বলেছিলেন, 'বিচ্ছিন্ন গণশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে, আল্লাহর খেলাফৎ প্রতিষ্ঠার পথে বীর মোজাহীদগণ এগিয়ে যাবে' (ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস)। শেষোক্ত বাক্যটি লেখক উদ্ধার করেছেন তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক' ১৬ মার্চ, ১৯৫২ সংখ্যা থেকে।

সৈনিক প্রকাশিত হয় ১৪ নভেম্বর, ১৯৪৮ সালে। প্রথম সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন শাহেদ আলী, পরে সেই পদে আবদুল গফুর। প্রথম

সম্পাদকীয়তে বলা হয় 'আমরা কায়েদে আযমের বিপ্লবী উত্তরাধিকার বহন করিতেছি।' কিন্তু পাকিস্তানের স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ধর্মাচরণ ও ধর্মবিষয়ক অনীহা সম্পর্কে সবাই জানেন। তিনি যে কোনো প্রকার ইসলামী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন নি সে ঐতিহাসিক সত্যও নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবে তিনি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে ভারতভাগে সফল হয়েছিলেন এ সত্য বহু আলোচিত ইতিহাসের অংশ। তাই কায়েদে আজমের রাজনৈতিক আদর্শ ইসলামি বিপ্লব হয় কীভাবে তা বোঝা কঠিন। আসলে জিন্নার প্রবল জনপ্রিয়তা ও সম্প্রদায়বাদী দ্বি-জাতিতত্ত্বই বোধ হয় এসব বক্তব্যের কারণ।

তমদ্দুন মজলিসের ভাষাবিষয়ক তৎপরতা সম্পর্কে বশীর লিখেছেন: 'তমদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক উদ্যোগেই ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলন বিশেষ গতি লাভ করেছিল। সেই সূচনাকালে তাঁরা ভাষাসংক্রান্ত যে প্রস্তাবগুলি করেছিলেন তা বাস্তব সম্মত ও গণতান্ত্রিক।' তবে একথাও সত্য যে ১৯৪৮-এর ঐ আন্দোলন অসম্পূর্ণ অবস্থায় যুক্তিহীনভাবে স্থগিত করার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকাই ছিল প্রধান যার খেসারত আন্দোলনকে দিতে হয়েছিল। এর পরিণাম বইতে হয় মজলিসকে।

তাই বশীরকে বলতে হয়েছেঃ 'অবশ্য সংগঠন হিসেবে তমদ্দুন মজলিস পরে আর ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম পর্বের মতো যুক্ত থাকতে পারেন নি। সেখানেই নিহিত ছিল তাদের দুর্বলতা' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩)। এ দুর্বলতার কারণ তাদের মতাদর্শগত রক্ষণশীলতা এবং সব দলের সঙ্গে বৃহত্তর স্বার্থেও মানিয়ে চলতে না পারা। এ সম্পর্কে দেওয়ান আজরাফ সাহেবের বক্তব্য বেশ চমকপ্রদ।

দুই

মজলিসের ইসলামি আদর্শের সমর্থক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বাংলা একাডেমিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভাষা-আন্দোলনে মজলিসের পিছিয়ে পড়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করেছেন। তার মতে 'ভাষা-আন্দোলন ক্রমে বামপন্থী প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী কর্মী, নেতা ও দলসমূহের হাতে চলে যায়। এইসব দলনিয়ন্ত্রিত আন্দোলনকে সমর্থন জুগিয়ে সমাজতন্ত্রের স্বার্থকে পোষণ বা সাহায্য করা তাদের আদর্শবিরোধী ছিল, তারা বিশ্বাস করতেন ইসলামের বিপ্লবী সম্ভাবনায়' (বশীর, পৃ. ১৮৩)।

ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের পিছু হটা সম্পর্কে দেওয়ান সাহেবের বিশ্লেষণের সঙ্গে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন বলে মনে হয় না। বাস্তব ঘটনা ও ভাষা-আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস তাই, বর্তমান সময়ে তা বিকৃত করার যত চেষ্টাই করা হোক না কেন। প্রাথমিকপর্বে তমদ্দুন মজলিস প্রভাবিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে এবং সেইসূত্রে মজলিসের ভাষা বিষয়ক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত মোহাম্মদ তোয়াহা তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন: 'ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। আমার নিজের এবং পার্টির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সত্য ঘটনাগুলোই বিবৃত করব' (একুশের সংকলন, বাংলা একাডেমি, ১৯৮০)।

তার ভাষায় 'তমদ্দুন মজলিস নামে একটি আধা-রাজনৈতিক আধা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। তমদ্দুন-মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম সাহেব। তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আর আমি ফজলুল হক হলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সে সময় কাসেম সাহেব আমাদের সকলকে ধরে নিয়ে তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি সেদিন সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি নি। কিন্তু মাঝেমধ্যে তমদ্দুন মজলিসে যেতাম' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭)। এ বক্তব্যে বিষয়টা স্পষ্ট যে সেই প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ সাতচল্লিশ-আটচল্লিশেও মোহাম্মদ তোয়াহা মজলিসের সদস্য বা আদর্শের অনুসারীও ছিলেন না।

এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে (২৮.৬. ১৯৬৮) তোয়াহা সাহেব তার মতামত আরো স্পষ্ট করেছেন। তমদ্দুন মজলিস ও কাসেম সাহেব সম্পর্কে তার বক্তব্য: 'তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক আবুল কাসেমের সাথে আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল।... কাসেম সাহেব ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলতেন এবং পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করা দরকার মনে করতেন।

কাসেম সাহেবদের ইসলামী তত্ত্বের গ্রাহ্যতা সম্পর্কে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আমি বস্তুতপক্ষে ক্রমশই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলাম। এজন্যে তমদ্দুন মজলিসের সাথে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না' (ব.উ. 'ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল,' পৃ. ২৯৩-৯৪)।

মোহাম্মদ তোয়াহা তার স্মৃতিচারণে প্রাথমিক পর্বে ভাষাবিষয়ক উদ্যোগের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও বিরূপ পরিবেশ (মূলত পুরান ঢাকাবাসীদের বিরোধিতা)

এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে শুরুতে তমদ্দুন মজলিস ও অন্যান্যদের চেষ্টা সত্ত্বেও রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিষয়টি ছাত্র ও কিছু সংখ্যক শিক্ষক বুদ্ধিজীবী ছাড়া কারো মনে দাগ কাটে নি। তার মতে 'এটাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করে ঢাকার ছাত্রসমাজ' (একুশের সংকলন, পৃ. ৮৭)। একই সূত্রে গুণ্ডাদের তমদ্দুন মজলিস অফিসে হামলা, ভাঙচুর এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অফিস ফজলুল হক হলে নিয়ে আসা সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'সেদিনই সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে এলাম ফজলুল হক হলে। বাইরে বড় করে লেখা হলো 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। আমি অন্য সকলের সাথে আলাপ পরামর্শ করতাম বটে, কিন্তু নিজে যা বুঝতাম তা-ই সিদ্ধান্ত নিতাম। এতে তমদ্দুন মজলিসের বন্ধুরা বাধা দেন নি। এভাবেই ভাষা সংগ্রাম পরিষদের অফিসটা ফজলুল হক হলে চলে এসেছিল। ভাষা-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এখান থেকেই জন্মলাভ করে' (স্মৃতিচারণ প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮)।

দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে এটা স্পষ্ট যে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কসহ মজলিসের নেতৃস্থানীয়দের প্রাধান্য সত্ত্বেও সংগ্রাম পরিষদ বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে কার্যকর আন্দোলন সংগঠিত করতে পারে নি। সম্ভবত নানা মতাদর্শের দ্বন্দ্ব এর কারণ। এ সম্বন্ধে ভাষা-আন্দোলনের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা আবদুল মতিনের বিচার ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট। মূলত নেতৃত্বের সমালোচনা করে আবদুল মতিন বলেনঃ 'এই নেতৃত্বের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দুর্বলতা এবং দোদুল্যমানতার কারণে ছাত্র বুদ্ধিজীবী ও জনগণের সমর্থন সত্ত্বেও ভাষা-আন্দোলনকে তারা বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। এদের একাংশ বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাগত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে এসময় নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিসের প্রাধান্য আন্দোলন বিকাশের অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে থাকে। কারণ তমদ্দুন মজলিসের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানে একটি ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এই উদ্দেশ্য সামনে থাকার কারণে ভাষার মত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়কে এরা তাদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধ্যান ধারণার বাইরে নিয়ে যেতে পারেন নি' (ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য, পৃ. ৪৭)।

তমদ্দুন মজলিসের ইসলামী আদর্শগত চিন্তাভাবনা ভাষার মতো সর্বজনীন চরিত্রের বিষয়ে আরোপ করার চেষ্টা গণতন্ত্রী ও প্রগতিবাদীদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সংগঠনগতভাবে তারা তখনো যথেষ্ট শক্তিমান না হওয়ায় প্রকাশ্যে তমদ্দুন-বিরোধিতা সঠিক বিবেচনা করেন নি। তাছাড়া

আন্দোলনের সর্বদলীয় শক্তিতে ভাঙন ধরানোও তাদের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। তাই মজলিসের একদেশদর্শী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী চরিত্র মেনে নিতে হয়েছে। এ অবস্থা ছিল আন্দোলনের স্বার্থে ঢেঁকি গেলার মত বিষয়।

তৎকালীন বাস্তব অবস্থা কমিউনিস্টদের পক্ষে ছিল না। মুসলিম লীগের কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ও ফ্যাসিবাদী শাসনের ফলে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা বিস্তার প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে ছাত্র ফেডারেশনের উদাহরণ টানা চলে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে, তোয়াহা সাহেবের ভাষায় 'ভাষা-আন্দোলন তমদ্দুন মজলিস এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃত্ব ও সহযোগিতাতেই পরিচালিত হয়' (ব.উ. সাক্ষাৎকার প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫)। সঙ্গে অবশ্যই ছিল গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি ভিন্ন মতাদর্শের নেতৃস্থানীয় ছাত্র-যুবা। মোহাম্মদ তোয়াহা নিজেই তার উদাহরণ।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এসময় মুসলিম লীগের মূল অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের কিছু সংখ্যক গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ও প্রগতিবাদী ছাত্রনেতা ও কর্মী মিলে পূর্ববঙ্গে একটি গণতান্ত্রিক-অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু সরকারের সাম্প্রদায়িক চরিত্র ও জনসাধারণের অন্ধ পাকিস্তানপ্রীতি ও ধর্মীয় মানসিকতার কথা মাথায় রেখে ঐ সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ', অবশ্য 'মুসলিম' শব্দটির রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কারো কারো আপত্তি সত্ত্বেও। নঈমুদ্দিন আহমদ হন এ সংগঠনের আহ্বায়ক।

মূল মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে বিচ্ছিন্ন এ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার বাইরে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বেশ সাংগঠনিক সাড়া জাগিয়ে ছিল। মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে তা দেখেছি। তাতে ছিল অধিকাংশ রাজনীতি-মনস্ক ছাত্রের ব্যাপক আগ্রহ। এতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই এখানকার ছাত্রযুব সমাজে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ দ্রুতই ঘটতে থাকে। সেই সঙ্গে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাও। পাকিস্তানি মতাদর্শ-বিরোধী এমন ধারার বিকাশ যেমন ভাষা-আন্দোলনের গণতান্ত্রিকতায় সাহায্য করেছে তেমনি ভাষা-আন্দোলনও জাতীয়তাবাদী ধারা ও প্রগতিধারার বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। এ পারস্পরিকতা অদ্ভুত হলেও সত্য।

নতুন এ সংগঠন ১১ মার্চের (১৯৪৮) ভাষা-আন্দোলন শুরুর আগেই গঠিত হয়। মুসলিম শব্দটির ব্যবহার নিয়ে সংগঠকদের আশংকা যে ভুল ছিল না তার প্রমাণ সংগ্রাম পরিষদ ও আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে সরকার ও মুসলিম

লীগদলীয় নেতা এবং উর্দুপন্থীদের প্রচার ছিল যে 'আন্দোলনকারীরা কমিউনিস্ট, তারা পাকিস্তান ধ্বংস করতে চায়।' কিন্তু আশ্চর্য যে ভাষার প্রশ্নে সরকার-বিরোধী সংগ্রাম পরিষদের প্রধান শরিক দল তমদ্দুন মজলিসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কেউ কেউ আন্দোলন-প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন, অনেকটা সরকারের লাগামহীন কথাবার্তার ধরনে। নানা মতাদর্শের সমন্বয়ে গঠিত কোনো সংগঠনের পক্ষে সফল আন্দোলন গড়ে তুলতে যে উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা আবশ্যিক শর্ত তা মজলিসের কোনো কোনো নেতা, বিশেষ করে অধ্যাপক কাসেমের মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না। তার বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে তা বোঝা যায়। হয়তো তাই সংগ্রাম পরিষদ মজলিস-প্রাধান্যের কালে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী আন্দোলন গঠনে টানাপোড়েনে ভুগেছে, তাতে আন্দোলন ব্যাহত হয়েছে। আদর্শগত সংকীর্ণতা এমন পরিণামই বয়ে আনে। তবে এদিক থেকে সৈনিক-সম্পাদক জনাব আবদুল গফুরকে কিছুটা ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়েছে।

মজলিসের কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ও ইতিহাস বিকৃতি

অনেকটা মুসলিম লীগ সরকারের মতোই অধ্যাপক আবুল কাসেম ভাষাবিষয়ক স্মৃতিচারণে কমিউনিস্ট পার্টি ও সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিহীন অবাস্তব বিরূপ মন্তব্য করেছেন, মনগড়া ঘটনা উত্থাপন করেছেন। সেক্ষেত্রে তার এমন অভিযোগও রয়েছে যে 'বামপন্থীরা আন্দোলনে অংশ নেয় নি, বরং তা স্যাবোটেজ করার চেষ্টা চালিয়েছে।' এ বিষয়ে ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন কথাই বলে। শুরু থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি অর্জনের তৎপরতায় প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তা সে আন্দোলন ঢাকা বা রাজশাহী, যশোর বা পাবনা যেখানেই হোক। ভাষা-আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস এমন সাক্ষ্যই দেবে। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

তিন

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ইতিবাচক তৎপরতা সত্ত্বেও আদর্শগত সংকীর্ণতার কারণে মজলিস নেতাদের কেউ কেউ, বিশেষ করে অধ্যাপক কাসেম কমিউনিস্ট-বিরোধী অপপ্রচারে ঘটনা বিকৃত করতেও দ্বিধা করেন নি। যেমন স্মৃতিচারণে (একুশের সংকলন, ১৯৮০) তিনি লিখেছেনঃ 'ঢাকা জজকোর্টের পিছনে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল, তাহাতে একদিন কমিউনিস্ট পার্টির এক মিটিং ছিল। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এই বৈঠকের নেতৃত্ব

করিতেছিলেন। সেখানে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে আমি কয়েকজন কর্মীসহ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি পার্টির তরফ হইতে আমাকে জানাইয়া দেন; এই আন্দোলনকে সমর্থন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু তাই নয় তিনি মেমোরেন্ডামে দস্তখত করিতেও অস্বীকার করেন। ছাত্র ফেডারেশনও ইহাতে যোগদান করিতে অস্বীকার করে (পৃ. ৬-৭)।

ঐ অভিযোগের জবাবে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ জানানঃ 'খুব বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এই বক্তব্যে কিঞ্চিৎ সত্যের অপলাপ আছে। একথা সত্য যে বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম, ঢাকায় আমাদের পার্টি অফিসে কয়েক ব্যক্তি একটা মেমোরেন্ডামে আমার দস্তখত নিতে এসেছিলেন এবং আমি তাতে দস্তখত দিই নি। তবে ভাষা-আন্দোলনকে সাহায্য করা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সম্ভব হবে না এমন কথা আমি কখনো বলি নি। এটা একেবারেই বানানো কথা। যারা আমার দস্তখত নিতে এসেছিলেন তাদের আমি বুঝিয়ে বলেছিলাম তাদের মেমোরেন্ডামে আমার দস্তখত দেওয়া উচিত হবে না। আমি স্থায়ীভাবে কলিকাতার বাসিন্দা। পাকিস্তান হওয়ার পরও আমি ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিই নি। আমার ধারণা হয়েছিল যে ভাষার দাবি মেমোরেন্ডামে আমি সই করলে পূর্ববঙ্গ সরকার একথা বলার সুযোগ পাবে যে ভাষা আন্দোলনের প্ররোচনা বাইরে থেকে এসেছে। পরে প্রমাণিত হয়েছে যে আমার ধারণা ভুল ছিল না' (সাপ্তাহিক সৈনিক, শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৫৩)।

কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের প্রতিবাদ-বক্তব্য খুবই স্পষ্ট এবং বাস্তবতাসম্মত। শুধু আটচল্লিশে কেন বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কেও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ও লীগদলীয় শীর্ষনেতাদের অনেকে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বরাবর এমন মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছেন যে বহিরাগত, কমিউনিস্ট ও ভারতীয় দালালদের চেষ্টা, সমর্থন ও সহযোগিতায় ভাষা-আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহীদের প্ররোচনা ও সাহায্য দিচ্ছে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন একই ভাষায় কথা বলেছেন।

আর কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন ভাষা-আন্দোলনে যোগ দেয় নি এ তথ্যও সঠিক নয়। ভাষা-আন্দোলনের প্রকৃত ঘটনা বা ইতিহাস থেকে স্পষ্টই প্রমাণ করা যায় যে সাতচল্লিশের বিক্ষোভ ও আটচল্লিশের আন্দোলনে

কমিউনিস্ট পার্টির নেপথ্য সমর্থনই নয়, পার্টির প্রকাশ্য নেতাকর্মী ও সমর্থক ছাত্রযুবানেতৃত্ব আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা-আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রযুবাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস, চরিত্র, সাংগঠনিক পরিচয় ও আনুগত্য বিচার করলেও এর প্রমাণ মিলবে। দেখা যাবে যে এরাই নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিশেষ করে বায়ান্নর আন্দোলনে।

সার্বিক বিচারে ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সাতচল্লিশের শেষ দিকে ভাষার দাবি নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পর থেকে, মূলত আটচল্লিশ মার্চের আন্দোলন পর্ব থেকে তাদের লক্ষ্য ছিল ভাষার অধিকার আদায়ের পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা। আটচল্লিশে আন্দোলন স্থগিত করা এবং উর্দুর পক্ষে ঘোষণা দিয়ে জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা ত্যাগের পর আন্দোলন শুরুর বিষয়ে তাদের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল নেতিবাচক।

মার্চের আন্দোলনে প্রশ্নবিদ্ধ তমদ্দুন মজলিস

১১ মার্চে সূচিত ভাষা-আন্দোলন এবং জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা সফর ও ঢাকা ত্যাগের পর গোটা বিষয়ের মূল্যায়নে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা প্রশ্নের জন্ম দেয়। মনে হয় মজলিস নেতারা রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার অর্জনের চেয়েও আন্দোলনে অনৈক্য সৃষ্টি ও কমিউনিস্ট বিরোধিতায়ই সময় ব্যয় করেছেন ও তৎপরতা দেখিয়েছেন বেশি। সেই সঙ্গে ছিল আন্দোলনের সব কৃতিত্ব নিজেদের ঘরে তুলে নেবার চেষ্টা। একের পর এক ঘটনা তাই প্রমাণ করে।

সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের আটদফা শান্তিচুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি আন্দোলনরত ছাত্রজনতাকে জানাতে গিয়ে সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম প্রধান নেতা অধ্যাপক আবুল কাসেম তাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন: 'ছাত্রজনতার ক্রমবর্ধিত উত্তেজনা লক্ষ্য করে আবুল কাসেম তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টায় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

'এর সাথে সাথেই চতুর্দিক থেকে সকলে তাকে ঘেরাও করে গালাগালি বর্ষণ করতে থাকলে তিনি চুক্তির শর্তগুলো তাদেরকে চীৎকার করে শোনাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের সাথে চুক্তি সম্পাদনের কথায় সকলে এতো বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে আবুল কাসেমের কথায় কর্ণপাত না করে তারা তার বিরুদ্ধেও দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

'এই অবস্থায় তোয়াহা প্রভৃতি কয়েকজন সেখানে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়ে তাদেরকে শান্ত করার জন্য বলেন যে চুক্তিটি চূড়ান্ত কিছুই নয়।... সরকার যদি তাদের ভাষা-বিষয়ক দাবি অস্বীকার করে তাহলে আন্দোলন তাঁরা চালিয়ে যাবেন। এই ঘোষণার পর জনতা শান্তভাব ধারণ করলেও বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে বিরত হয় না' (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২)। কারণ নাজিমুদ্দিনের উপর ছাত্রজনতার মোটেও আস্থা ছিল না। তাই 'ঘটনাস্থলেই সংগ্রাম কমিটির নেতাদেরকে পরদিন ১৬ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানাতে হয়' (প্রাগুক্ত)।

এ ঘটনা থেকে তমদ্দুন-প্রধান, সংগ্রাম পরিষদ এবং এর অন্যতম প্রধান নেতা অধ্যাপক কাসেম সম্বন্ধে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার মনোভাব তথা আস্থার অভাব স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা সফরের অজুহাতে অনেক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলন স্থগিত করা হয়। এমনকি সংগ্রাম পরিষদ জিন্নাহ সাহেবের জন্য একটি সম্বর্ধনা কমিটিও গঠন করে। কিন্তু কথিত 'জাতির পিতা' উর্দুর পক্ষে একতরফা ঘোষণা দেওয়ার পর বিব্রত সংগ্রাম পরিষদের তমদ্দুন নেতা অধ্যাপক কাসেম ২২ মার্চ এক বিবৃতিতে ব্যর্থতার দায় এড়ানোর উদ্দেশ্যে বলেন, 'কায়েদে আজমের নিকট যদি সরাসরিভাবে ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন দাবীদাওয়া পেশের সুযোগ লাভ করিতাম তাহা হইলে আমাদের স্থির বিশ্বাস, আমরা তাহাকে স্পষ্টতঃ বুঝাইতে সমর্থ হইতাম যে পাকিস্তানে মুসলিম লীগের সংগঠনই এই আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা (দৈনিক আজাদ, ২৪, ৩, ১৯৪৮)।

কিন্তু জিন্নাহ সাহেবকে 'বুঝানো' যে কাসেম সাহেবদের জন্য দিবাস্বপ্ন হয়ে ওঠে তার প্রমাণ মেলে ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় তাদের 'কায়েদে আজমে'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলাফল থেকে। তাদের দেওয়া স্মারকলিপি জিন্নাহ সাহেব আমলেই আনেন নি যদিও এর শুরুতে বলা হয় 'এই পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত।' এতসব সত্ত্বেও জিন্নাহ সাহেবের মন গলে নি। এমন কি ২২ মার্চের বিবৃতিতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও অপপ্রচার করেও কোনো লাভ হয় নি। পাকিস্তানি একনায়ক তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন যে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এমনকি নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদিত আটদফা চুক্তি সম্পূর্ণ অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য বলে তিনি তা বাতিল করে দেন।

বাইশে মার্চের বিবৃতি থেকে অধ্যাপক কাসেম তথা তমদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। তাতে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বাম-বিরোধিতাই প্রকট।

এমন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত ১১ মার্চের ভাষাগত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরিত্র হনন করে অধ্যাপক কাসেম মুসলিম লীগকে আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু তাতেও কূল রক্ষা হয় নি। বিচক্ষণ আইনজ্ঞ জিন্নাহ সাহেবের চিত্তজয় সম্ভব হয় নি। তেমনি পূর্বোক্ত স্মারকলিপিতে সাম্প্রদায়িক প্রকাশ ঘটিয়েও কার্যসিদ্ধি সম্ভব হয় নি। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর ঠিকই বলেছেন 'কর্মপরিষদের মধ্যে আবুল কাশেমের মতো কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫)।

অনেক চেষ্টায় স্থগিতকরা আন্দোলনে অধ্যাপক কাসেম 'বিরাট সাফল্য' ও 'বিজয়' দেখতে পেলেও তা যে নেতাদের কারণেই অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল ইতিহাস তেমন সাক্ষ্যই দেয়। তমদ্দুন মজলিসের কোনো কোনো নেতার মধ্যে একদিকে হতাশা অন্যদিকে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা ত্যাগের পর সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠকে ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিসের নেতাদের মধ্যে আন্দোলনের কল্পিত বিজয়ের কৃতিত্ব নিয়ে তর্কবিতর্ক চলে, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

সম্ভবত ব্যর্থতার দায়ভার থেকে মুক্তি পেতে পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল আলম পদত্যাগ করেন। তিনি স্বীকার করেন যে আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে সত্যিকার কিছু করার জন্য নতুন সংগ্রাম পরিষদ দরকার। পুরাতন পরিষদ এদিক থেকে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বৈঠক শেষে শামসুল আলম মোহাম্মদ তোয়াহাকে কাগজপত্র বুঝিয়ে দেন (উমর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬)।

আহবায়কের বক্তব্য থেকেই বুঝতে পারা যায় যে তমদ্দুন-প্রভাবিত সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় রেখেছে। এ সত্যটা জনাব উমর এভাবে বলেছেনঃ 'তমদ্দুন মজলিস আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বিশেষত যখন তা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু মার্চের প্রথম দিক থেকে আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্র পরিগ্রহ করার সাথে সাথে তমদ্দুন মজলিসের গুরুত্ব এবং তাদের নেতৃত্বের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। এই পরবর্তী পর্যায়ে গণতান্ত্রিক

যুবলীগভুক্ত কর্মীবৃন্দ, মুসলিম ছাত্রলীগ এবং সাধারণ ছাত্রসমাজই আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে' (প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৬)।

শুধু সংগ্রাম পরিষদই নয়, মার্চের আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসও যে প্রত্যাশিত ভূমিকা নিতে পারে নি, নিয়েছে গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রসমাজ উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যে তা স্পষ্ট। মজলিস ও সংগ্রাম পরিষদের আপসপন্থী নেতারা আন্দোলন স্থগিত করার ক্ষেত্রে বরং প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। এবং জিন্নাহ সাহেবের বাংলা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে হতাশ মজলিস নেতাদের কেউ কেউ উদ্ভূত পরিস্থিতি ও ব্যর্থতার দায় অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন, বিশেষ করে বামপন্থীরা হয়েছে মজলিসের সমালোচনার শিকার।

তাদের বক্তৃতা বিবৃতিতে বিষয়টা স্পষ্ট, বিশেষ করে যখন অধ্যাপক কাসেম নিজদের আস্তিন পরিষ্কার করতে গিয়ে জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে বলেন: 'কিন্তু এবার আন্দোলনে অনেকে আগাইয়া আসিতে রাজী হইল না। ইহার কারণ হইল কায়েদে আজমের আগমনের পর তাহার বক্তৃতায় ও ব্যক্তিত্বে ছাত্রদের অনেকে এবং জনসাধারণ আন্দোলনের বিরোধী হইয়া পড়ে। (একুশের সংকলন, ১৯৮০)। এ মূল্যায়নও শতভাগ সঠিক নয়।

একথা সত্য যে জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার পর ছাত্র-জনতার একাংশে ভাষা সম্পর্কে নিরুত্তাপ ভাব দেখা দেয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে ভাষার দাবি নিয়ে উত্তাপ তখনো কম ছিল না। জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা শুনে ক্ষুব্ধ যে ছাত্ররা সম্বর্ধনা তোরণ ভাঙচুর করতে পারে, 'নো-নো' বলে বিরোধিতা জানাতে পারে তাদের নিয়ে ধীরেসুস্থে হলেও ভাষার দাবিতে আবার সংগঠিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদে বিরাজমান মতভেদ ও অনৈক্যের কারণে তা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া মজলিসের প্রধান নেতৃত্ব জিন্নাহ-বিরোধিতার বদলে হতাশা নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। হয় তো এর কারণ 'কায়েদে আজমে'র কথিত বিপ্লবী উত্তরাধিকার বহনের প্রভাব।

সেই সঙ্গে তারা নিজদের দায়মুক্ত রাখতে 'আন্দোলন বিপথগামী' করার বানোয়াট গল্প কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমর্থকদের ওপর চাপিয়ে দেন। তাদের বক্তব্য ছিল অবিকল সরকারি অপপ্রচারের মতো। অধ্যাপক কাসেম তাই অবলীলায় বলতে পেরেছেন: 'তৃতীয় আরেক দল এই আন্দোলন স্যাবোটাজ করার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য ইহারা... ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য

ছিলেন।...এইভাবে সরকারি গুপ্তচররা, মন্ত্রীত্ব লোভীরা আর তথাকথিত প্রগতিশীলরা একজোট বাঁধিয়া ভাষা-আন্দোলনকে স্যাবোটাজ করার বা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিবার কাজে লাগিয়া যান' (প্রাগুক্ত)।

এ ধরনের অভিযোগের জবাবে বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে, আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন রাষ্ট্রপ্রধানের ঢাকা সফরের অজুহাতে আন্দোলন স্থগিত করার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানোর জন্য তমদ্দুন মজলিসকেই, বিশেষ করে কাসেম সাহেবকে বরং আন্দোলন স্যাবোটাজ করার দায়ে অভিযুক্ত করা যায়। বিরাজমান পরিস্থিতিতে তাদের প্রভাব কমে যাওয়ার কারণে তারা আন্দোলন সক্রিয় রাখার বদলে সরকারের সঙ্গে আপসরফার চুক্তির মাধ্যমে আন্দোলন স্থগিত করে 'বিজয়ে'র কৃতিত্ব নিতে চেয়েছিলেন, যা তাদের জন্য পরে ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। তাই সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারতো রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিতে ছাত্রজনতার আন্দোলন সক্রিয় রেখে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে স্থানীয় ছাত্রজনতা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে কতটা আন্তরিক। তাতে হয়তো জিন্নাহ সাহেব বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারতেন। কিন্তু তমদ্দুন-প্রভাবিত সংগ্রাম পরিষদের আপসবাদী দুর্বলতার কারণে এ সত্য জিন্নাহ সাহেবের সামনে তুলে ধরা যায় নি। অবশ্য তুলে ধরতে পারলেও যে কোনো সুফল মিলতো না তার প্রমাণ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ভাষা প্রসঙ্গে জিন্নাহ সাহেবের উগ্র অনড় মতামত। সে উগ্রতা তার নানা বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। দেখা গেছে তার সম্প্রদায়বাদী সংকীর্ণতা ও গণতন্ত্র-বিরোধী একনায়কসুলভ মনোভাব, সর্বোপরি বাংলা বাঙালি বিদ্বেষ।

অধ্যাপক কাসেমের মতো আরেক মজলিস নেতা শাহেদ আলী একই সুরে কথা বলেন। আন্দোলনের শেষ পর্যায় সম্পর্কে ৩১ মার্চে তার বক্তব্যও সঠিক ছিল না। তার ভাষায় 'দুর্ভাগ্যবশত কতিপয় তথাকথিত কমিউনিস্ট ও মন্ত্রীসভা-বিরোধী যুবক একদল নির্দোষ সরলমতি ছাত্রকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়া বিগত ১৬ মার্চ তারিখে পরিষদগৃহে উপস্থিত করেন। আমাদের এই সুষ্ঠু আন্দোলনকে তাহাদের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বানচাল করাই ছিল তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও অন্যতম প্রয়াস' (বশীর, পৃ. ২৫৫)।

তার ঐ বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। বশীর আল হেলালও বলেছেনঃ 'সেদিনের বিক্ষোভ যে মিছিলটি থেকে উৎসারিত হয়েছিল, আমরা দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের সভা থেকে সেটিকে

ধাবিত করে নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান যিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। আসলে সেদিনের বিক্ষোভকারী সাধারণ ছাত্ররা, স্বাভাবিক কারণেই, সংগ্রাম পরিষদ ও নাজিমুদ্দিনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উপর এবং বিশেষভাবে নাজিমুদ্দিনের উপর এবং লীগ দলের পরিষদ সদস্যদের উপর আস্থা ন্যস্ত করতে পারছিলেন না। ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের জোর সেদিন কম ছিল না। বরং আমরা দেখেছি কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা মোহাম্মদ তোয়াহা সেদিন অশান্ত ছাত্রদের শান্ত করার চেষ্টা কেবল করেন নি, তমদ্দুন নেতা আবুল কাসেমকে তাঁদের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন' (বশীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-২৫৬)।

একই সঙ্গে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বশীর বলেছেন, ভাষা-আন্দোলন যত রাজনৈতিক চরিত্র পরিগ্রহ করতে থাকে, ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের গুরুত্ব ও ভূমিকা তত কমে আসে। যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্যরা তাঁদের স্থান ক্রমে দখল করে নেন। তমদ্দুন মজলিসের হতাশার ইঙ্গিত এর আগে আবুল কাসেমের ২২শে মার্চের বিবৃতিতে পেয়েছি, যাতে তিনি ভাষা-আন্দোলনের তথাকথিত বিপথগামিতার জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করেছেন, তমদ্দুন মজলিসের শাহেদ আলীও ৩১ মার্চ ভাষা-আন্দোলনকে ভ্রান্ত পথে চালনার জন্য কমিউনিস্টদের উপর দোষারোপ করেন (প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৫)। ঘটনার এ ধরনের বিকৃতি ছাড়াও শাহেদ আলীর পূর্বোক্ত বিবৃতিতে যে কায়েদে আজমের ভাষা সংক্রান্ত স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলা হয় নি সেকথাও বশীর উল্লেখ করেছেন উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যের পরপরই।

স্বভাবতই তথ্য ও যুক্তি এবং ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে বলা যায়, আন্দোলনে অনৈক্য সৃষ্টি এবং তাতে পিছুটানের দায় অনেকটাই তমদ্দুন মজলিসের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর বর্তায়। সংগ্রাম পরিষদের ব্যর্থতাও এই একই কারণে। এ দায় বামপন্থীদের নয়। তবু মজলিস নেতারা কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বরাবর আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করে এসেছেন।

আমরা যতদূর জানি বামপন্থীদের বরাবরের চেষ্টা ছিল আন্দোলনের নেতৃত্বে সর্বদলীয় চরিত্র এবং সংহতি রক্ষা করা যাতে আন্দোলন মাঝপথে মুখ থুবড়ে না পড়ে, তার শক্তি সামর্থ্য সক্ষমতা বাড়ে।

কিন্তু নিজ মতাদর্শের প্রতি চরম আনুগত্যের কারণে তমদ্দুন মজলিসই বরং সংগ্রাম পরিষদের শরিক ভিন্ন মতাদর্শের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিবৃতি ও

বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলনের ঐক্য ও সংহতি নষ্টের চেষ্টা করেছে। সেই সঙ্গে চলেছে তাদের দলীয় শক্তি বৃদ্ধি ও আন্দোলনের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা। এসব কারণে মার্চের আন্দোলন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নি, 'বিজয়' তো দূরের কথা। ফলে রাজনীতি সচেতন ছাত্রজনতার উপর মজলিসের প্রভাব কমেছে, তাদের সংগঠনগত শক্তিও হ্রাস পেয়েছে এবং একপর্যায়ে ভাষিক কর্মকাণ্ডের প্রবাহ থেকে তাদের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতাও সত্য হয়ে ওঠেছে। তাই বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের তেমন কোনো ভূমিকা দেখা যায় নি।

এমনকি আটচল্লিশ মার্চের যে আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিস 'বিজয়' প্রত্যক্ষ করেছিল, পিছুহটা ভাষা-আন্দোলন চাঙ্গা করে তুলতে ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ পালনে তাদের কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি। বরং ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং নাদেরা বেগম, তকিউল্লাহ, নাসির আহমেদ প্রমুখের নেতৃত্বে দিনটি পালনের চেষ্টা চলে। তখন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন চলছে। বিক্ষোভকারীদের মিছিলটি পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে পরিষদ ভবন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি। বরং ছাত্রকর্মী অনেককে মিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয়। এই ক্ষীণ শক্তির প্রধান কারণ কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন বামহঠকারী নীতির ফলে পূর্ববঙ্গে তাদের রাজনৈতিক জনবিচ্ছিন্নতা এবং সে সুযোগে প্রচণ্ড সরকারি দমন নীতি। এতদসত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে পিছু হটে নি। চেষ্টা করেছে সব আন্দোলনে নিজদের অবস্থান নিশ্চিত করতে। তাতে বরং তারা সরকারি চণ্ডনীতির শিকার হয়েছে।

ইতিহাস বিকৃতির চরম রূপ

ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর ও বশীর আল হেলাল তাদের ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক ইতিহাসগ্রন্থে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। তাদের বিবরণ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ বর্তমান আলোচনায় উদ্ধার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আবদুল মতিনের মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষা- আন্দোলনে তাদের বিশেষ ভূমিকা প্রমাণের চেষ্টা তমদ্দুন মজলিসের মূল নেতাদের কেউ কেউ গোড়া থেকেই শুরু করেছিলেন।

সম্প্রতি তার চরম রূপ প্রকাশ পেতে চলেছে ভাষা-মিউজিয়াম নামক সংগঠনকে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে এম.এ. বার্নিকের লেখাগুলো ইতিহাস বিকৃতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। স্পষ্টতই এ ধরনের তৎপরতার উদ্দেশ্য ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে

ধরা। আর সেজন্য সত্যের খাতিরে বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিপরীতে প্রকৃত ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এ প্রচেষ্টা দলবিশেষের প্রতি পক্ষপাত নয়।

বছরকয়েক আগে এম.এ. বার্নিক 'জনকণ্ঠ' ও 'প্রথম আলো'র মত জনপ্রিয় পত্রিকায় ইতিহাসের নামে ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর তথ্যাদি পরিবেশন করতে থাকেন। তার লেখাগুলো খতিয়ে দেখলে একটা কথাই পাঠকের মনে হবে, ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসই একমাত্র ভূমিকা পালন করেছে। অন্য কেউ নয়। লেখাগুলোতে ভুল তথ্যের পরিমাণ এত বেশি যে প্রতিবাদ জানাতে গেলেও পুরো একটি সংশোধনী বই লিখতে হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত যে দু'একটি লেখার বিভ্রান্তিকর তথ্য চোখে পড়েছে সে সম্পর্কে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট তৎকালীন দুই মেডিকেল ছাত্র সাঈদ হায়দার ও শরফুদ্দীন আহমদ প্রতিবাদপত্র লেখেন যা প্রথম আলোতে ছাপা হয়। ইতিপূর্বে এ কথাটি বলা হয়েছে। নতুন তথ্য হলো জনাব বার্নিকের লেখায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের সেসময়কার ছাত্র বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দারকে যথাক্রমে তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দপ্তর সম্পাদক এবং মজলিসের ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শেষোক্ত জন সম্পর্কে আরো বলা হয় যে তিনি মজলিসের ছাত্রফ্রন্ট 'ছাত্রশক্তি'র সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। একই ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যপূর্ণ বিবরণ একাধিক কাগজে ছাপা হয়েছিল।

১৪ ফেব্রুয়ারি (২০০৪) 'প্রথম আলো'তে প্রকাশিত জনাব বার্নিকের লেখার প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকায় ১৮ ফেব্রুয়ারি (২০০৪) তারিখে। ডা. সাঈদ হায়দারের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের মূল কথা ছিলঃ 'আমি তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। প্রকৃত তথ্য হলো ওই সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজে তমদ্দুন মজলিসের বা ছাত্র শক্তির কোনো ইউনিট ছিল না।... তাছাড়া আমার বিশিষ্ট বন্ধু জনাব বদরুল কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিল না।...আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসের চরিত্রহননে ক্ষুব্ধ হয়েছি।'

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন আহমদ পূর্বোক্ত ভাষাবিষয়ক তথ্য 'উদ্ভট ও অসত্য' বলে উল্লেখ করে যে প্রতিবাদ লিপি 'প্রথম আলো'তে পাঠান তা প্রকাশিত হয় ২৪, ০৪, ২০০৪ তারিখে। তিনিও মন্তব্য করেন 'বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দার সাহেবদের

তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে যুক্ত করে জনাব বার্নিক ইতিহাসের তথ্য বিকৃতি ঘটিয়েছেন। এর সংশোধনী প্রকাশিত হওয়া দরকার এবং তা ইতিহাসের প্রয়োজনে।' ভাষা-আন্দোলনে আমার সংশ্লিষ্টতা ও অভিজ্ঞতা একই কথা বলে।

এ প্রসঙ্গে জনাব বার্নিক মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে তৈরি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের নকশা সম্পর্কে তৎকালীন সরকারি চিকিৎসক (অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন) মীর্জা মাজহারুল ইসলামের সংশ্লিষ্টতার কথা লিখেছিলেন, সে তথ্যও যে ঠিক নয় তা শহীদ মিনার তৈরির দায়িত্বে কর্মরত শরফুদ্দিন আহমদকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে। আমরা জানি এবং তখন আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল ছাত্রমাত্রেই জানে যে স্মৃতিস্তম্ভের নকশা তৈরি করেছিলেন বদরুল আলম। দুর্ভাগ্যবশত বদরুল আলম বেঁচে নেই। কিন্তু ডা. হায়দার এখনো সচল। তার কাছেও সঠিক তথ্য মিলবে। আমার কথা নাই বা বলি।

জনাব বার্নিকের ভুল তথ্য উল্লেখের প্রবণতা সম্পর্কে ২৭ ফেব্রুয়ারি (২০০৪) 'জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখায়ও দেখা গেছে। জনাব বার্নিক বদরুদ্দীন উমরের ভাষা বিষয়ক ইতিহাসগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড থেকে একটি তথ্য উদ্ধার করেছেন এভাবে '২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ভাষা-আন্দোলনে কারারুদ্ধ কর্মী আজমল হোসেনের কামরায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব একটি বৈঠক ডাকেন। উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তমদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক ফ্রন্টের আহ্বায়ক আবুল হাশিম।'

কিন্তু সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে শেষ বাক্যটি লেখা হয়েছে এভাবে:...'উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম'। এমন কি উদ্ধৃতির মূল উৎস অলি আহাদের 'জাতীয় রাজনীতি, গ্রন্থে (পৃ. ১৭২) জনাব বার্নিকের উদ্ভাবিত 'তমদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক ফ্রন্টের আহ্বায়ক' শব্দগুলো নেই। জনাব বদরুদ্দীন উমর এ ধরনের বক্তব্য সঠিক নয় বলে মতামত প্রকাশ করেছেন।

তাহলে প্রশ্ন: কেন, কী উদ্দেশ্যে এ ধরনের কল্পিত বক্তব্য পরিবেশন? এটা যে তমদ্দুন মজলিসকে ভাষা-আন্দোলনের প্রধান সংগঠন হিসেবে জোরালো ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লেখা তা কোনো পাঠকেরই বুঝতে না পারার কথা নয়। আশ্চর্য যে জনাব বার্নিকের লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত 'ভাষা-আন্দোলনের সার গ্রন্থটিতেও জনাব হাশিমের নামের সামনে ঐ বিশেষায়িত

শব্দগুলো বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লিখিত ১৩৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে (২০০৯-এ প্রকাশিত) তথ্যবিকৃতির পরিমাণ এতই যে প্রতিটি ভুলের বিপরীতে প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে লিখতে গেলে অনুরূপ আয়তনের একটি সংশোধনী গ্রন্থ লিখতে হয়। প্রকৃত সত্য হলো জনাব হাশিম কখনোই তমদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক ফ্রন্টের আহ্বায়ক ছিলেন না। এ-সব বানোয়াট তথ্য।

দুই

কিন্তু ইতিহাসে তো ভুল তথ্য পরিবেশনের সুযোগ নেই এবং নেই বলেই ইতিহাসের প্রয়োজনে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে। সে তথ্য যতটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তার চেয়েও বেশি ভাষা-আন্দোলনের গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থের যুক্তিনিষ্ঠ উপস্থাপনা থেকে উদ্ধৃত। ক্ষেত্রবিশেষে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বক্তব্য থেকে গৃহীত। এককথায় সংশোধনী তথ্যাদি যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে বা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে নেওয়া হয়েছে। তাই সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, ছোটখাটো বিষয় বাদ দিয়ে। তা না হলে পুনরাবৃত্তির ভাগ বেশিই হতো।

জনাব বার্নিকের লেখা 'ভাষা-আন্দোলন সারগ্রন্থ' পড়তে গেলে পূর্বাপর যে বিষয়টা চোখে পড়ে তা হলো আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রায় সবাইকে 'তমদ্দুন মজলিস নেতা' হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা। যেমন ফজলুল হক হলের তৎকালীন ভি.পি. মোহাম্মদ তোয়াহা (পৃ. ১৩) সম্পর্কে গ্রন্থে পরিবেশিত বক্তব্য।

জনাব তোয়াহা যে শুরুতেও তমদ্দুনপন্থী ছিলেন না তার স্মৃতিচারণে ও সাক্ষাৎকারে তিনি একাধিকবার কথাটা বলেছেন যা ইতিপূর্বে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলা হয়েছে। তাই পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কথাটা আমরাও জানি।

তমদ্দুন মজলিসের পূর্বোক্ত যে পুস্তিকা জনাব বার্নিকের মতে 'ভাষা-আন্দোলনের ঘোষণাপত্র' তার সঙ্গে জুন-জুলাই (১৯৪৭)-এ জনাব আবদুল হকের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক লেখাগুলো তুলনা করে দেখলে সেগুলোকেই অগ্রজের মর্যাদা দিতে হয়। এমনকি ড. এনামুল হকের রচনাটিও (কৃষ্টি, মাসিকপত্রে প্রকাশিত) বড় একটা পিছিয়ে পড়ে না। অবাক হতে হয় পড়ে যে ঐ পুস্তিকা

নাকি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল' (পৃ. ১৯)। উদ্ভট যত সব কথা!

মার্চের আন্দোলন সম্পর্কে জনাব বার্নিক লিখেছেন: '২৯ ফেব্রুয়ারি থেকেই তমদ্দুন মজলিসের কর্মসূচির প্রতি ছাত্রলীগের নিঃশর্ত সমর্থনদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়' (পৃ. ৩৪)। কিন্তু এ বিষয়ে দৈনিক আজাদ-এর তথ্য ভিন্ন কথা বলে। পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী '২৮শে ফেব্রুয়ারি তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের যুগ্ম রাষ্ট্রভাষা সাবকমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে... ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হবে।' (বশীর, পৃ. ২১৮)। এরকম একটি যৌথ সিদ্ধান্তকে কি নিঃশর্ত সমর্থন তথা আত্মসমর্পণ বলা চলে? অন্যত্র ছাত্রলীগকে 'তমদ্দুন মজলিসের সিস্টার সংগঠন' (পৃ. ১২২) বলা হয়েছে। জানি না ছাত্রলীগের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

১৫ মার্চ সংগ্রাম পরিষদ ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত আপসরফার চুক্তি নিয়ে ছাত্রজনতার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনাব বার্নিক লিখেছেন: 'অধ্যাপক আবুল কাসেম চুক্তিপত্রের কপি নিয়ে সোজা চলে এলেন জনতার মাঝে।...অধ্যাপক আবুল কাসেম জনতাকে শান্ত হতে বলেন এবং তাদের দাবি মেনে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে তা পড়ে শোনান। এ সময়ে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। মাঠ থেকে শুরু হয় জনতার বিজয় মিছিল। আস্তে আস্তে সকলে মাঠ থেকে বিজয় মিছিলে শরিক হন। অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি বিজয় মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়' (পৃ. ৪১)।

কিন্তু ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর ও বশীর আল হেলাল এবং সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ ঐ বিপরীত প্রতিক্রিয়ার কথাই লিখেছেন। যেমন 'ছাত্রজনতার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা লক্ষ্য করে আবুল কাসেম তাদের শান্ত করার চেষ্টায় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সবাই চারদিক থেকে ঘেরাও করে গালাগাল করতে শুরু করেন। তিনি চুক্তির শর্তগুলি তাদের চীৎকার করে শোনাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের কথায় তাঁরা অতিরিক্ত উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন, আবুল কাসেমের কথা শুনতে চান না।

'এ অবস্থায় মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ কয়েকজন সেখানে গিয়ে তাদের বোঝান যে এই চুক্তি আলোচনার সূত্রপাত মাত্র। সরকার তাঁদের দাবি মানতে অস্বীকার

করলে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এই ঘোষণায় জনতা তাদের প্রতি শান্ত হলেও বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করলেন না।'... এমনকি ক্ষুব্ধ ছাত্রজনতাকে শান্ত করতে 'আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম কমিটির নেতাদের সেখানেই পরদিন, ১৬ মার্চ, আবার সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানাতে হয়' (বশীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০)। এমনটাই ছিল বিজয় মিছিলের পরিস্থিতি। উল্লেখ্য যে ১৬ ও ১৭ মার্চ পর্যন্ত এ বিক্ষোভ চলেছে। অন্যদিকে জনাব কাসেম তার স্মৃতিচারণে চুক্তিকে 'বিরাট সাফল্য' আখ্যায়িত করেও বিজয় মিছিল সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। বরং বলছেন যে চুক্তির কথা শুনে 'প্রায় সকলেই খুশী হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে থাকে' (একুশের সংকলন, পৃ: ১৫)। তাহলে 'বিজয় মিছিল'-এর কল্পনা কোথা থেকে এল? কেন এল? উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

জনাব বার্নিকের লেখায় আরো একটি প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো, কী আটচল্লিশ কী বায়ান্ন— ভাষা-আন্দোলনের ভিন্ন মতাদর্শের নেতাদের বা নেতৃস্থানীয় কর্মীদের রাজনৈতিক চরিত্র পালটে দেবার চেষ্টা। তাদের তমদ্দুন মজলিসের সদস্য বা ঐ আদর্শের অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করা যা আদৌ সঠিক নয়, ইতিহাসসম্মত আচরণ তো নয়ই। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে সাঈদ হায়দার, বদরুল আলম ও আবুল হাশিম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

বায়ান্নর আন্দোলন প্রসঙ্গে ছাত্রনেতাদের কথা বলতে গিয়ে বার্নিক সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেন শহুদকেও তমদ্দুন মজলিসের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (পৃ. ৫১, ১১৭)। এ বিষয়ে সৈয়দ কমরুদ্দীন শহুদ নিজে কী বলেছেন দেখা যাক। একুশের স্মৃতিচারণে (একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৭, বাংলা একাডেমি) তিনি লিখেছেন 'বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শেষ পর্বের ছাত্র। বামপন্থী ছাত্র রাজনীতিতে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম।'

শুধু নিজের সম্পর্কে নয়, তার সহকর্মীদের নাম উল্লেখ করেও তিনি বলেন: 'সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল ছাত্রগোষ্ঠী হিসেবেই আমরা পরিচিত ছিলাম। মুসলিম লীগ ও সরকারবিরোধী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। ফ্যাসিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার ছিলাম। আমাদের আলোচনা সভা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবকিছুই আমরা কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন করতাম' (পৃ. ৪২, ৪৫)।

এ লেখায় তিনি সহকর্মী ও আদর্শের দিক থেকে সমমনা বলে উল্লেখ করেছেন 'অলি আহাদ, কে.জি. মোস্তফা, হাসান হাফিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান শেলী, এম.আর. আখতার মুকুল, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, এ জেড, ওবায়দুল্লাহ খান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবদুল মতিন, ফয়েজ আহমদ, এস.এ.বারী' প্রমুখের নাম যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার 'ছাত্ররাজনীতির সাথী ছিলেন' (পৃ.৪৫)।

উল্লিখিতদের দু-একজন মধ্যপন্থী বা গণতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হলেও বাকি সবাই যে বামপন্থায় বিশ্বাসী তা বলতে পারি। অনুরূপ চিন্তায় বিশ্বাসীদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় গাজীউল হক, আনোয়ারুল হক খান, আতিকুল্লাহ, দেবপ্রিয় বড়ুয়া, রফিকুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন চৌধুরী প্রমুখ আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের নাম। তাই 'ছাত্রনেতা গাজীউল হক মজলিসের ভাবধারায় পুষ্ট' (পৃ. ১১৭) এমন তথ্য যে কতটা উদ্ভট তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিন

গোটা বইটিতে তথ্যগত ভুল বা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য এতই বেশি যে আলাদা ভাবে প্রতিটি তথ্য অপ্রমাণ করতে হলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখতে হয়। গোটা আন্দোলন নিয়ে তো বটেই, এমন কি মেডিকেল হোস্টেলে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম সম্পর্কেও ভুল তথ্য দিয়েছেন লেখক। তিনি লিখেছেন: 'গুলিবর্ষণের পর একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভি.পি. গোলাম মাওলার উদ্যোগে ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়' (পৃ. ৫৭)। পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে লেখককে প্রশ্ন করা যায়, 'সন্ধ্যার পর স্থাপিত' কন্ট্রোল রুমে মওলানা তর্কবাগীশ কীভাবে বিকেলে পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেছিলেন। তাছাড়া 'আজাদ' ও 'ইনসাফ' পত্রিকায় (২২ ফেব্রুয়ারি) লেখা হয়েছে যে বেলা ৪টার পর হোস্টেলের মাইকযোগে নিহতদের জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য ছাত্র জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

প্রকৃত তথ্য হলো একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুরেই কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মাইক নিয়ে ২০ নম্বর ব্যারাকের সর্বপশ্চিমে ১ নম্বর কক্ষে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেন কয়েকজন মেডিকেল ছাত্র। এ সম্বন্ধে ইউনিয়নের জি.এস. শরফুদ্দিন আহমদ বলেছেনঃ পরিষদ ভবনের নিকটতম বিশের এক নম্বর কক্ষে কন্ট্রোলরুম স্থাপন

করা হয়। কলেজ ইউনিয়নের উদ্যোগে বেলা বারোটার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেন আমাদেরই ছাত্রবন্ধু ইয়াহিয়া। স্পিকার লাগানো হয় হোস্টেলের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত আমগাছের ডালে। একেবারে পরিষদ ভবনের নাকের ডগায়' (ভাষা-আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্যপূর্ণ: ১১৪)।

একই বক্তব্য মেডিকেল ছাত্রকর্মী হুমায়ুন হাই, ফজলে রাব্বী, সাঈদ হায়দার প্রমুখের (প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১১৪-১১৫)। যেমন ২৩ তারিখে শহীদ মিনার তৈরি, তেমনি কন্ট্রোল রুম স্থাপনের ও ১৪৪ ধারা ভাঙা সংক্রান্ত প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপনের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা সবই করেছে মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্র। সেখানে কাজী গোলাম মাহবুব বা অন্যকোনো নেতার বা ব্যক্তির কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। উল্লিখিত বিষয়ের পুরোপুরি কৃতিত্ব একমাত্র মেডিকেল ছাত্রদেরই।

জনাব বার্নিক নবগঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সম্পর্কেও ভুল তথ্য দিয়েছেন এই বলে যে 'গুলিবর্ষণের পর কাজী গোলাম মাহবুবের উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে এক গোপন বৈঠকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।' প্রকৃত তথ্য জনাব উমরের ভাষায় 'ঐদিন (২১ ফেব্রুয়ারি) রাত্রি ৯টার সময় অলি আহাদের উদ্যোগে মেডিকেল কলেজের ৪ নম্বর ব্যারাকের ৩ নং কামরায় ভাষা-আন্দোলনের যে সব কর্মী কাছাকাছি ছিলেন তাদের একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মেডিকেল কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য গোলাম মাওলাকে অন্তর্বর্তীকালের জন্য অস্থায়ী সম্পাদক করে এক নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ঠিক সেই মুহূর্তে অকার্যকর হয়ে পড়ার কারণেই আন্দোলনের তাগিদে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, এমাদুল্লাহ প্রভৃতি এই বৈঠকে উপস্থিত থেকে পরদিনের কর্মসূচি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেন (উমর, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮)।

উল্লেখ্য যে ঐ বৈঠকে মেডিকেল কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্র অনেকে (লেখক সহ) উপস্থিত ছিলেন। কাজেই কাজী গোলাম মাহবুব সম্পর্কে কাল্পনিক তথ্য বিশ্বাস করা চলে না। তাছাড়া কাজী গোলাম মাহবুব সেদিন সন্ধ্যায় গুলিবর্ষণে ছাত্র-অছাত্র হতাহত হওয়ার দায় এড়াতে আন্দোলন তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এমনকি পরদিনের কর্মসূচি সম্বলিত ইস্তাহারের খসড়ায় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছিলেন সে কথা

আবদুল মতিন অনেকবার বলেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও বলা যায় সে তথ্য ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসেও স্থান পেয়েছে। নতুন কমিটিতে জনাব বার্নিকের তথ্যমতে অন্তর্ভুক্ত কবিরউদ্দিন আহমদকে তমদ্দুন মজলিসের অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মতে চট্টগ্রামে কিছুদিন মজলিসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠকালে তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর বামপন্থী এবং বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের সময়েও তাই।

চার

শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি ও তার নকশা সম্পর্কেও কিছু ভুল তথ্য দেখা যায় জনাব বার্নিকের বইতে। আন্দোলনে সক্রিয় মেডিকেল কলেজের তৎকালীন ছাত্রদের মধ্যে যারা এখনো জীবিত তারাই সাক্ষ্য দিতে পারবেন যে স্মৃতিস্তম্ভের নকশা তৈরিতে মূল ভূমিকা রাখেন বদরুল আলম। অথচ জনাব বার্নিক ২০০৪ সালে 'প্রথম আলো'তে এবং পরে আলোচ্য বইতে আরো জোরালো ভাষায় বলেছেন যে 'শহীদ মিনার নির্মাণের বিষয়ে প্রথম চিন্তা করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সদ্য এম বি. বি. এস পাশ করা হাউজ সার্জন ডা. মীর্জা মাজহারুল ইসলাম (তমদ্দুন মজলিস সদস্য)।' শুধু তাই নয়। প্রথম আলো'তে (১৪.২.২০১৪) তিনি লিখেছেন তৎকালীন ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের হাউস সার্জন ডা. মীর্জা মাজহারুল ইসলাম ঐ কলেজের ছাত্র বদরুল আলমের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য এক সিনিয়র ছাত্র সাঈদ হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে তিনজনে মিলে স্মৃতিস্তম্ভের নকশা দাঁড় করিয়ে ফেলেন।'

এ বিবরণের প্রতিবাদ জানিয়ে 'প্রথম আলো'তে চিঠি লেখেন সাঈদ হায়দার (প্রকাশিত ১৮ ফেব্রুয়ারি) এবং তৎকালীন কলেজ ইউনিয়নের জি.এস. শরফুদ্দিন আহমদ (প্রকাশিত ২৪ ফেব্রুয়ারি)। তাদের মতে শহীদ মিনারের নকশা আঁকেন বদরুল আলম, সঙ্গে সাঈদ হায়দার। ব্যক্তিগত আলাপে ডা. (কর্নেল) শরফুদ্দিন বলেছেন: 'ডা. মীর্জা সাহেব এসব কর্মকাণ্ডের ধারে কাছেও ছিলেন না।' তিনি শহীদ মিনার তৈরির তদারকি কাজে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন এবং এসব তথ্য আমাদের সেকালের সহকর্মী সবারই জানা। তার মতে ২৩ ফেব্রুয়ারি সকালে নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের আলোচনার মধ্য দিয়ে শহীদ মিনার তৈরির কথা উঠে আসে। এবং জনাব গোলাম মাওলা বদরুল আলমকে একটা নকশা আঁকার

দায়িত্ব দেন। প্রথম নকশা পছন্দ না হওয়ায় তার সঙ্গে যোগ দেন সাঈদ হায়দার। সর্বশেষ আঁকা নকশাটি মনোনীত হওয়ার পর কাজ শুরু।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার যে সে সময় মুসলিম লীগ সরকারের চণ্ডনীতি এমনই প্রবল ছিল যে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সরাসরি সরকারবিরোধী কোনো আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। যোগ দেবার অবধারিত পরিণাম চাকরি হারানো। তবে একথা ঠিক যে আহতদের সেবায় তাদের কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে তারা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। প্রসঙ্গত আরো একটি কথা বলতে হয় শহীদ মিনার শহীদ রফিকউদ্দিনের নয়, বরং ১২ নম্বর ব্যারাকের সামনে আবুল বরকতের গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্থানটির কাছেই তৈরি করা হয়। এবং 'পিয়ারু সরদার রাজমিস্ত্রি ও নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে এসে মিনার তৈরির ব্যবস্থা করে দেন' এ তথ্যও (পৃ. ৯৮) সঠিক নয়। পিয়ারু সরদারের বাড়িতে কয়েকজন মেডিকেল ছাত্র গিয়ে সিমেন্ট গুদামের চাবি নিয়ে আসেন, সেটাই ঘটনা। এ অভিজ্ঞতা লেখকেরও। ভাষা-আন্দোলন, বিশেষ করে বাহান্নর আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের অবদান ও প্রভাব চিহ্নিত করতে গিয়ে জনাব বার্নিক সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্যকে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে তমদ্দুন মজলিসের সদস্য বা সংশ্লিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের তথ্যগত ত্রুটির কথা আগে বলা হয়েছে। জনাব আবুল হাশিমকে তিনি বরাবরই 'তমদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক ফ্রন্টের আহবায়ক' বলেছেন যা আদৌ ঠিক নয়। এ বিষয়ে ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস প্রণেতা, বদরুদ্দীন উমর সঠিক তথ্য দিতে পারবেন। বগুড়ার যুবলীগ নেতা ও স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য গোলাম মহিউদ্দিনকে তমদ্দুন মজলিসের সহকারী সম্পাদক হিসেবে পরিচিত করা রীতিমতো আপত্তিকর। ইব্রাহিম তাহা 'মজলিসের রাজনৈতিক ফ্রন্টের নেতা' নন, তিনি ছিলেন 'ইসলামিক ব্রাদার হুড' নামক সংগঠনের নেতা।

বরং একথাই সত্য যে, বায়ান্ন সালের ভাষা-আন্দোলন পরিচালনায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আপসবাদ, পিছুহটা ও ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় প্রথম সারির কর্মতৎপর নেতাদের মধ্যে তমদ্দুন মজলিসের কোনো নেতাকে দেখা যায় নি।

আন্দোলনে সক্রিয় বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অলি আহাদ, আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, ইমাদুল্লাহ, মাহবুব জামাল জাহেদী, গাজীউল হক,

কমরুদ্দিন শহুদ, আনোয়ারুল হক খান, মোহাম্মদ সুলতান, হাবিবুর রহমান শেলী, আবদুস সামাদ প্রমুখ। এদের কয়েকজন অবশ্য ১৪৪-ধারা অমান্যের প্রক্রিয়ায় ২১ তারিখেই গ্রেফতার হয়ে কারাগারে চলে যান। কিন্তু এরা কেউ তমদ্দুন মজলিস বা আওয়ামী ছাত্রলীগের নেতা নন।

মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে সক্রিয় নেতৃস্থানীয় গোলাম মাওলা, শরফুদ্দিন, সাঈদ হায়দার, মঞ্জুর হোসেন, আলী আজমল, মোহাম্মদ জাহেদ, আলীম চৌধুরী, আলী আছগর প্রমুখ (গোলাম মাওলা বাদে) ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। গোলাম মাওলার রাজনৈতিক জীবন শুরু একুশের আন্দোলনের মাধ্যমে। পরে তিনি পাশ করে চিকিৎসাজীবনে ছিলেন আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একবার পরিষদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আর সর্বদলীয় পরিষদের (যা বিশে ফেব্রুয়ারির বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে বিলুপ্ত) আহবায়ক কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান প্রমুখ আওয়ামী ছাত্রযুব নেতারা ১৪৪ ধারা অমান্যের বিরোধিতা করে আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে ছিটকে পড়েন, যদিও পরে আন্দোলনের কেন্দ্র মেডিকেল হোস্টেলে যাতায়াত ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

সলিমুল্লাহ হলের নেতারা এককভাবে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এখানে নেতৃত্ব ছিল ডান, বাম ও মধ্যপন্থীদের নিয়ে মিশ্র চরিত্রের। এর মধ্যে তৎকালীন ভি.পি. জি-এস ডানপন্থী ছাত্রনেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এরা ছিলেন আদর্শ-বিচারে মুসলিম লীগ সমর্থক, কিন্তু 'তমদ্দুন মজলিসে'র সদস্য বা অনুসারী নন। আর ফজলুল হক হল ও জগন্নাথ কলেজের ভাষাসংগ্রামী ছাত্রনেতারা প্রায় সবাই ছিলেন বামঘরানার। মিটফোর্ড স্কুলের নেতৃস্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ বাম রাজনীতির অনুসারী, জনাদুয়েক জাতীয়তাবাদী ধারার।

পাঁচ

পূর্বাপর ইতিহাস বিচার করে দেখা যায়, সাতচল্লিশে এবং আটচল্লিশের শুরুতে অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক পর্বে ভাষা-আন্দোলনের প্রস্তুতিকালে তমদ্দুন মজলিসের সক্রিয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী পর্যায়ে, এমনকি বাহান্নর আন্দোলনে মজলিসের ভূমিকা গৌণ। আন্দোলন পরিচালনায় ও নেতৃত্বে তা প্রায় শূন্যের কোঠায়।

ঢাকার বাইরে জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের আন্দোলনে কোনো কোনো শহরে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্বে বা চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে যুবলীগ, বামপন্থার অনুসারী নেতাকর্মী এবং আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ। যেমন আটচল্লিশে তেমনি বায়ান্নে। জনাব বার্নিক তার বইতে ২৩টি শহরের তালিকায় তমদ্দুন মজলিসের নেতাবিশেষের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার মধ্যেও অসংখ্য ভুল তথ্য রয়েছে, অর্থাৎ অন্য মতাদর্শের ব্যক্তিকে তমদ্দুন মজলিসের নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ১১৫-১৬)।

তার দীর্ঘ তালিকা উদ্ধৃত না করে বরং ঢাকার বাইরের শহরগুলোতে আন্দোলনে সক্রিয় মূল নেতৃত্বের পরিচয় তুলে ধরলেই তালিকায় উল্লিখিত ভুলভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে আমাদের লক্ষ্য থাকবে মূলত বার্নিক কথিত ঐ ২৩টি শহরে সক্রিয় নেতৃত্বের উপর। ঐ তালিকার প্রথম শহর চট্টগ্রাম দিয়েই শুরু করা যায়। এক্ষেত্রে আমাদের তথ্য মূলত 'ভাষা-আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস' 'বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা-আন্দোলন' 'রাজশাহীতে ভাষা-আন্দোলন' 'কুমিল্লায় ভাষা-আন্দোলন' 'ভাষা-আন্দোলন: ইতিহাস ও উত্তরপ্রভাব' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে গৃহীত, এবং সেই সঙ্গে রয়েছে ব্যক্তিক পর্যায়ের কিছু তথ্য।

চট্টগ্রামে সংঘটিত আন্দোলন ও নেতৃত্ব বিষয়ক আমাদের সংকলিত তথ্যের উৎস বিপ্লবী বিনোদবিহারী দাশগুপ্তের লেখা যা ১৯৮৮ সালে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র প্রকাশিত হয় (একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা)। বিনোদ দাশগুপ্ত লিখেছেন; 'একথা সত্য যে '৫২-এর ২১-এ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকার অনুরূপ ব্যাপকভিত্তিক সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা সম্ভব হয় নি। তবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে মূলত কিছু সংখ্যক যুবকের (বিশেষত বামপন্থীদের) উদ্যোগে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।... এ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী। কমিটির নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন পরবর্তী কালের হারুন ন্যাপপ্রধান চৌধুরী হারুন-উর রশীদ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক গোপাল বিশ্বাস, নুরুল আজিম (মেডিকেল ছাত্র), তৎকালে ছাত্র ও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা ডা. সৈয়দুর রহমান, ডা. সরোজ দে, লুৎফর রহমান ও শাহাবুদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তি।

জনাব দেলোয়ার হোসেন অবশ্য আরো কয়েকটি নাম যোগ করে কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে চৌধুরী হারুন-অর রশীদ ও এম.এ. আজিজের কথা উল্লেখ

করেছেন। বাইশেরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত কমিটিতে অবশ্য তমদ্দুন মজলিশের আজিজুর রহমানের নাম রয়েছে সদস্য হিসেবে, বার্নিক কথিত ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক হিসেবে নয়। তিনি লিখেছেন, মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর অসুস্থতার কারণে 'চৌধুরী হারুন-অর রশীদ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন' (পৃ. ৯২)। কাজেই জনাব বার্নিকের দেয়া তথ্য নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। অর্থাৎ সেগুলো সঠিক নয়। জনাব হারুন-অর-রশিদ ছিলেন বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের নেতা।

রাজশাহীতে বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতে গঠিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এস.এম.এ. গাফফার, যুগ্ম-সম্পাদক গোলাম আরিফ টিপু (পরবর্তী সময়ে ন্যাপ নেতা), ও হাবিবুর রহমান (রাজশাহীতে ভাষা-আন্দোলন,' পৃ. ৬৩)। এদের সমর্থনে এসেছিলেন এম.এল.এ মাদারবক্স থেকে শুরু করে মমতাজউদ্দিন আহমদ, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, ক্যাপ্টেন শামসুল হক প্রমুখ নানা মতের বিশিষ্টজন। প্রায় একই রকম লিখেছেন তসিকুল ইসলাম: '১৯৫২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির পরই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।' তার তথ্য মতেও কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মাদারবক্স (এম.এল.এ.), ক্যাপ্টেন শামসুল হক, মজিবর রহমান অ্যাডভোকেট, হবিবুর রহমান, আতাউর রহমান (বামপন্থী নেতা), ডা মেসবাহুল হক বাচ্চু, মহসিন প্রামাণিক, ইয়াসিন আলী, আবদুর গাফফার, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, মমতাজউদ্দিন আহমদ, লুৎফর রহমান মল্লিক, আবুল কালাম চৌধুরী প্রমুখ। কারো তথ্যেই সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে জনাব বার্নিক কথিত তমদ্দুন নেতা আনসার আলীর উল্লেখ নেই।

বগুড়ার আন্দোলন সম্পর্কে পূর্বোক্ত আঞ্চলিক ইতিহাসে লেখা হয়েছে: '১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় বগুড়া আযিযুল হক কলেজ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্র ফেডারেশন নেতা মুহম্মদ আবদুল মতীন।...১৯৪৮ সালের প্রধান প্রধান ঘটনাপ্রবাহে অংশগ্রহণ করে যারা ভাষা-আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন তারা হলেন আতাউর রহমান (সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক), অধ্যাপক গোলাম রসুল, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল মতিন, অধ্যাপক আবুল খায়ের, গাজীউল হক' প্রমুখ (পৃ. ১৪৫-৪৬)। এদের পরিচয় সবারই জানা।

বাহান্নর আন্দোলনের জন্য গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সভাপতি প্রবীণ রাজনীতিবিদ (যুক্তফ্রন্ট দলীয় প্রাদেশিক সদস্য) মজিরউদ্দিন আহমেদ, আহ্বায়ক বামপন্থী গোলাম মহিউদ্দিন। সদস্য হিসেবে ছিলেন ন্যাপনেতা, কৃষক নেতা, আওয়ামী লীগ নেতাসহ অনেকে। বামপন্থী গোলাম মহিউদ্দিন ছিলেন যুবলীগ নেতা ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। জনাব বার্নিক তাকে তমদ্দুন মজলিসের সহকারি সম্পাদক বানিয়ে দিয়েছেন। জনাব মহিউদ্দিন জীবিত না থাকলেও তার বন্ধুরা এবং লেখক নিজেও তার রাজনৈতিক পরিচয় ভালোভাবেই জানেন।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ-এর আন্দোলনে রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া ও হাতেম আলী তালুকদারের ভূমিকা ইতিহাসেই নয় সেসময় মুখে মুখে উচ্চারিত ছিল অনেকটা কিংবদন্তির মত। সেখানে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আনন্দমোহন কলেজের শিক্ষক বদরুদ্দীন হোসাইন এবং সম্পাদক ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া। যার পরিচয় জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে।

মুন্সীগঞ্জের রাজনীতিতে ১৯৪৭ থেকেই ছিল বামপন্থীদের প্রাধান্য। আটচল্লিশের আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা রাখেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জীতেন ঘোষ, ছাত্র ফেডারেশনের সফিউদ্দিন আহমদ, অজয় রায়, ছাত্রী স্মৃতিকণা গুহ প্রমুখ। সেখানে ১৯৪৮-এ স্থানীয় কলেজের ছাত্র হিসেবে আমার স্মৃতি একই। বায়ান্ন ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে।

সে সময়ে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন 'ঢাকা জেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতিন, বামপন্থী নেতা জীতেন ঘোষ, ডা. এম.এ. কাদের, একে আর আহমদ বাসেত, সফিউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এদের অধিকাংশ বামরাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মতীন কীভাবে তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক হতে পারেন তা সত্যই বোঝা কঠিন।

জামালপুরে ভাষা-আন্দোলন ১৯৪৮ থেকেই শুরু হয়। আঞ্চলিক ইতিহাসে বলা হয়েছে '১৯৫১ সালের শুরুতেই জামালপুর আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা তৈয়ব আলী আহমেদকে সভাপতি, অধ্যাপক জহুরুল ইসলামকে সম্পাদক এবং আওয়ামী ছাত্রলীগের তৎকালীন মহকুমা সভাপতি আক্তারুজ্জামান মতি ও আশেক মাহমুদ কলেজে ছাত্রসংসদের জি.এস. সৈয়দ আবদুস সোবহানকে যুগ্ম সম্পাদক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

গঠিত হয়' (পৃ. ৫২)। ছাত্রলীগের মহকুমা সভাপতি জনাব বার্নিকের লেখায় তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক হয়ে উঠেছেন।

ফরিদপুরে ভাষা-আন্দোলনও ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু। আটচল্লিশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হন রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র মহিউদ্দিন আহমদ। পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হন খান বাহাদুর ইসমাইল হোসেন। এছাড়া ছাত্র আন্দোলনে ৪৮ থেকে ৫২ পর্যন্ত নেতৃত্বে ছিলেন লিয়াকত হোসেন, এম.এ. লতিফ, শেখ মহিউদ্দিন, মোল্লা জালাল প্রমুখ অনেকে। মজলিসের মনোয়ার হোসেন আহ্বায়ক ছিলেন এ তথ্য সঠিক নয়।

দিনাজপুরে যেমন আটচল্লিশে তেমনি বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে ছিল বাম রাজনীতির প্রাধান্য। আটচল্লিশে বামপন্থী ছাত্রনেতা মির্জা নুরুল হুদা ছোটি, এম.আর. আখতার মুকুল, দবিরুল ইসলাম, গোলাম রহমান, আসলেহউদ্দিন প্রমুখ নেতৃত্বে ছিলেন। বায়ান্ন সালে 'সাংগঠনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তুখোড় ছাত্রনেতা মির্জা নুরুল হুদা ছোটি ও আসলেহউদ্দিন। এছাড়া ছিলেন ছাত্রলীগের দবিরুল ইসলাম, আবদুল হাফিজ, দলিলউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ ফরহাদ ও মো. নাসিম।

পাবনায় আটচল্লিশের আন্দোলন সফল করতে গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, কমিউনিস্ট পার্টি, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, মুকুল ফৌজ, ছাত্র কংগ্রেস, জনকৃষ্টি সংসদ, মুসলিম লীগ কর্মী ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগত সরকারি চাকুরিরত কিছু সংখ্যক যুবকের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে ২৯ ফেব্রুয়ারি মাহবুবুর রহমান খান ও আমিনুল ইসলাম বাদশাকে সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। বায়ান্ন সালে এডোয়ার্ড কলেজ কেন্দ্রিক ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্রলীগ নেতা আবদুল মোমিন তালুকদারের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন চলে। আন্দোলনের প্রভাব পড়ে ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহরে। এ আন্দোলনে বার্নিক-কথিত মীর আবুল হোসেনের নেতৃত্বের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

সিরাজগঞ্জে ভাষা-আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৮-এ। বামপন্থী ছাত্রনেতা সাইফুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে সিরাজগঞ্জে ভাষা-আন্দোলন কমিটি গঠিত হয়। 'সিরাজগঞ্জে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে সাইফুল ইসলাম পরবর্তীকালে গণতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা। ভাষাসংগ্রামী আজিজ মেহের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে

জড়িত। আর মোতাহার হোসেন তালুকদার আওয়ামী লীগ জেলা শাখার সভাপতি (পৃ. ২০৩)। সাইফুল ইসলামকে তমদ্দুন মজলিসের নেতা বানানোর পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

বাগেরহাটে ১৯৪৮-এ যে ভাষা-আন্দোলন কমিটি গঠিত হয় ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন মনসুর আহমদ, বার্নিক কথিত আশরাফ হোসেন নয়। বাহান্নর গঠিত কমিটি অব 'অ্যাকশন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক মীর মোশাররফ আলী ও অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র (পৃ. ২১৫)।

কুষ্টিয়ায় বাহান্নর ১৭ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। অ্যাডভোকেট আবদুল হক, ডা. আবুল কাসেম, ছাত্রী শাহিদা খাতুন, সৈয়দ আলতাফ আলী, গোলাম কিবরিয়া, খন্দকার মহিউদ্দিন প্রমুখ ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেষ্টা চালান। বাহান্নে তা আন্দোলনের রূপ নেয়। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত আবদুল হক সাহেব তমদ্দুন মজলিসে যুক্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। উল্লিখিত নেতারা কেউ জাতীয়তাবাদী, কেউ বামপন্থী।

কুমিল্লায় ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে দুই পর্বেই ভাষা-আন্দোলন প্রতিবাদী রূপ নিয়ে সংঘটিত হয়। আটচল্লিশে এতে মুখ্য ভূমিকা রাখেন সিদ্দিকুর রহমান, দলিলুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সভার আয়োজক কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, ফরোয়ার্ড ব্লক ও মুসলিম লীগের প্রগতিশীল কিছু কর্মী ও সমর্থক। 'আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন জহিরুল হক ও আবদুর রহমান খান। মূলত ছাত্র বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে রাজনীতিকরা যুক্ত হন। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, আর.এস.পিসহ বামপন্থী দলগুলো ও যুবলীগ সংশ্লিষ্ট ছিল। অধ্যাপকদের মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন আসহাবউদ্দিন আহমদ, আবুল খায়ের, হাসান ইমাম প্রমুখ (পৃ. ১১৪, ১১৫)। এরা সবাই কমবেশি বাম ঘরনার।

কক্সবাজারে আন্দোলন শুরু হয় বায়ান্নর ২২ ফেব্রুয়ারি। ছাত্ররাই মূল উদ্যোক্তা। খালেদ মোশাররফ, নুরুল হুদা চৌধুরী, আখতারুজ্জামান চৌধুরী, নাসিরুদ্দিন প্রমুখ ছাত্রদের চেষ্টায় প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমর্থন ছিল বিভিন্ন পেশার উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যক্তির। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ যেমন গঠিত হয় নি তেমনি নাম পাওয়া যায় না বার্নিক কথিত আহ্বায়ক কবির আহমদ চৌধুরীর।

গাইবান্ধায় আন্দোলনের সূচনা বায়ান্ন সালে। ছাত্রদের আন্দোলনে সমর্থন জানায় স্থানীয় বিড়ি শ্রমিকশ্রেণি। আন্দোলনের তুঙ্গ পর্যায়ে গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হন মতিউর রহমান এবং সম্পাদক হাসান ইমাম টুলু (ছাত্র ফেডারেশন), দুই সহ-সভাপতি মজিবর রহমান ও খন্দকার আজিজুর রহমান। শেষোক্তজন চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে জয়ী, তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কথা জানা যায় না। এছাড়া সক্রিয় ছিলেন বামপন্থী ছাত্রনেতা কার্জন আলী।

কিশোরগঞ্জে আন্দোলন উপলক্ষে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হেদায়েত হোসেন। ছাত্রনেতা আবু তাহের খান পাঠান, হেদায়েত হোসেন, নজরুল ইসলাম, এ.বি. সিদ্দিক, মাহফুজুল হক, শাহাদাত চৌধুরী, আবদুল কাদের প্রমুখের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পূর্বোক্ত বিবরণে যুগ্ম আহ্বায়ক বা নজরুল ইসলাম যে তমদ্দুনপন্থী তেমন তথ্য পরিবেশিত হয় নি।

নেত্রকোণায় অধ্যাপক আমিরুল্লাহ চৌধুরীকে আহ্বায়ক ও অছিমউদ্দিন আহমেদকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। নেত্রকোণার আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন অছিমউদ্দিন, ফুলে হোসেন, আবদুল খালেক, ফজলুর রহমান খান, আবদুল কুদ্দুস, আবদুল হাকিম, নুরুল হুদা, শামসুল হক, গাজী গোলাম মোস্তফা, বীরেন্দ্র, আবদুস শহীদ প্রমুখ।

নীলফামারিতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের যৌথ সভার সিদ্ধান্তক্রমে কর্মসূচি পালনের জন্য নেপথ্য দায়িত্বে ছিলেন আবু নাজেম মোহাম্মদ আলী, শামসুল হক ও শওকত আলী এবং প্রকাশ্যে শাফিয়ার রহমান, আলিয়ার রহমান, খোরশেদ আলম, আব্বাস আলী, কাদেমুল হক প্রমুখ ছাত্রনেতা। এরা তমদ্দুন নন।

যশোরে ভাষা-আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা রাখে ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের আলমগীর সিদ্দিকী ও ছাত্র ফেডারেশনের রণজিৎ মিত্র রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত হন। সদস্য হামিদা রহমান, সুধীর কুমার রায়, দেবীপদ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ আফজল হোসেন, আফসার সিদ্দিকী, অশোক ঘোষ, সুনীল রায়, নাজিমউদ্দিন, হায়তুল্লাহ, কাজী আবদুর রাকীব। এদের অধিকাংশ সমাজবাদী মতাদর্শের। জনাব বার্নিক কথিত শীর্ষস্থানীয়

তমদ্দুন নেতা মোশাররফ হোসেন খানের কোনো উল্লেখ নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে নেই।

রংপুরে ভাষা-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন ছাত্রনেতা মতিউর রহমান, আজিজুর রহমান, সুফি মোতাহার হোসেন এবং আরো অনেকে। আর সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সভাপতি আবুল হোসেন মিয়া (পৃ. ১৬৫) বার্নিক কথিত অধ্যাপক গোলাম আযম নন। (এদের মধ্যে সুফি সাহেব ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

ফেনীতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে। ফেনী কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমদকে আহবায়ক করে ফেনীর যুবলীগ, আওয়ামী লীগ, জাতীয় কংগ্রেস, তমদ্দুন মজলিস, সংস্কৃতি সংসদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়' (পৃ. ১১০)। অথচ জনাব বার্নিক আহ্বায়ক হিসেবে তমদ্দুন মজলিসের ফরমানউল্লা খানের নাম উল্লেখ করেছেন।

জনাব বার্নিকের বিবরণে ভাষাসংগ্রামীদের রাজনৈতিক পরিচয় নির্ধারণে সততা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় মেলে না। তাই তার উল্লিখিত তালিকার বাইরে বিভিন্ন শহরে ভাষা-আন্দোলনের মূল নেতৃত্বের পরিচয় দেখে নেওয়া যেতে পারে, যেখানে ছিল গণতন্ত্রী ও বামপন্থীদের প্রাধান্য, তমদ্দুন মজলিস কোথাও কোথাও উপস্থিত, কিন্তু নেতৃত্বে বা পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় নয়। তাই বলতে হয় আন্দোলনে যার যতটা ভূমিকা সত্যটাই ইতিহাসে আসা উচিত, জবরদস্তি সেক্ষেত্রে অনভিপ্রেত।

এছাড়া কয়েকটি শহরে ভাষা-আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের চরিত্র বিচারে একইরকম সত্য ধরা পড়ে। যেমন কট্টর মুসলিম লীগ নেতা সবুর খান শাসিত **খুলনা শহরে** ভাষা-আন্দোলনের চরিত্র বিচারে দেখা যায়, যথারীতি দৌলতপুর কলেজ হয়ে ওঠে আন্দোলনের মূল শক্তিকেন্দ্র। ১৯৪৭-ফেব্রুয়ারিতে সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভার 'সভাপতি মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা আবদুল হামিদ। বক্তৃতায় আমজাদ হোসেন, মনসুর আলী এবং ধনঞ্জয় দাস ও জগদীশ বসু প্রমুখ বামপন্থী ছাত্র নেতা। আন্দোলন সংগঠনে সংশ্লিষ্ট মূলত ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশ। ছাত্র ফেডারেশনের পূর্বোক্ত নেতারা ছাড়াও ছিলেন বামপন্থী স্বদেশ বোস, সন্তোষ দাশগুপ্ত, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। আর ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাহমীদ উদ্দিন আহমেদ,

জিল্লুর রহমান, মতিয়ার রহমান প্রমুখ। উল্লেখ্য এই বামপন্থী ছাত্র আনোয়ার হোসেনই রাজশাহী জেলে খাপড়াওয়ার্ডে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান।

এখানে বায়ান্নর আন্দোলনও পরিচালিত হয় প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছাত্র নেতা এম.এ. গফুর, শামসুদ্দীন, তোফাজ্জেল হোসেন, আবদুল বারি প্রমুখের হাতে। এদের সঙ্গে নেতৃত্বে ছিলেন বামপন্থী চিন্তার মীজানুর রহিম, জাহিদুল হক, নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

তেভাগা আন্দোলনের সাহসী ঐতিহ্যে লালিত **নড়াইলে**ও ভাষা-আন্দোলন দুই পর্বেই (১৯৪৮ ও ১৯৫২) পরিচালিত হয়েছে মূলত বামপন্থীদের তৎপরতায়। এরা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। ছাত্রীরাও এতে অংশ নেয়। প্রগতিশীল চিন্তার রাজনীতিক আফসার আহমদ মোক্তার প্রাথমিকপর্বে নেতৃত্ব দেন। পরে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রনেতারা অংশ নেন। এছাড়াও বায়ান্নর আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল বামপন্থী নেতা বিমল বিশ্বাস, নেপাল সরকার প্রমুখের।

সিলেট তথা শ্রীহট্ট সমাজপ্রগতি ও রক্ষণশীলতা দুইয়ের সমন্বয়ে গড়া হলেও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রগতিশীলতারই প্রাধান্য। তাতে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রকাশও ছিল স্পষ্ট। অনেকটা ব্যতিক্রমী ঘটনাই বলতে হয় যে ১৯৪৭ সাল থেকেই সিলেটে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি প্রকাশ পায়। প্রতিবেদক তাজুল মোহাম্মদের ভাষ্যে বলা হয়েছে ১৯৪৭-এর আগস্ট সংখ্যা আল ইসলাহ'র সম্পাদকীয়তে লেখা হয় 'বাংলা ভিন্ন অন্যকোনো ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হইবে না।' পরবর্তী পর্যায়ে সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে প্রচারে নামে।

এ পর্যায়ে বাংলার পক্ষে সৈয়দ মুজতবা আলীর মতামত বিশেষ গুরুত্ব পায়। বাংলা-উর্দু বিতর্কে বাংলার পক্ষে প্রচারে এগিয়ে আসেন ভাষাসচেতন নারীপুরুষ। পরিণামে দেখা যায় ১৯৪৮-জানুয়ারিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবদুর রব নিশতারের সিলেট আগমন উপলক্ষে তার কাছে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে দাবি তোলেন মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আবদুস সামাদ (আজাদ)। ১৯৪৮ ফেব্রুয়ারি সিলেটি মহিলাগণ মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের কাছে একই দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেন।

এতে স্বাক্ষর দেন মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী বেগম যোবেদা খাতুন চৌধুরী এবং তার সহকর্মী শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নজিবুনেচ্ছা খাতুন

এবং রাবেয়া খাতুন। এরা সবাই রাজনৈতিক দিক থেকে আধুনিক ও প্রগতিচিন্তার মানুষ। তবে প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়া ধর্মান্ধদের বিরোধিতাও কম ছিল না। উর্দুর পক্ষেও পাল্টা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অভিযোগ দেশদ্রোহী কমিউনিস্ট ও ইসলামের শত্রুরা বাংলার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে।

সিলেটে ১৯৪৮-সালের ভাষা-আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বামপন্থী চিন্তাবিদ আখলাকুর রহমান, শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা ও নজিবুন্নেছা খাতুন, তাসাদ্দক আহমদ, আবদুস সামাদ (আজাদ), দেওয়ান গোলাম মুর্তজা, আবদুল বারী, নির্মল চৌধুরী, হিমাংশু ভট্টাচার্য, এস.এ.এম.এস কিবরিয়া, মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ। এদের সিংহভাগ বাম রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী।

সিলেটে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের মূল ব্যক্তি ছিলেন পীর চান নি রহমান, মহম্মদ আলী, আবদুর রহিম, নুরুর রহমান, মতছির আলী, এ.এইচ সাদত খান, হাজেরা মাহমুদ, সৈয়দ মোতাহের আলী প্রমুখ। এদের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতাগণ। যেমন প্রসূনকান্তি (বরুণ) রায়, অনিমেষ ভট্টাচার্য, অনন্তদেব প্রমুখ! ছিলেন জাতীয়তাবাদী ভাবধারার কবি দিলওয়ার, ফারুক চৌধুরী প্রভৃতি মেধাবী ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ।

ছয়

ভাষা-আন্দোলনের প্রগতি-প্রধান এই মিশ্র চরিত্রের নেতৃত্ব প্রদেশের অধিকাংশ শহরে লক্ষ্য করা গেছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে সুনামগঞ্জ, বরিশাল থেকে বগুড়া, মানিকগঞ্জের তেরশ্রী থেকে উত্তরের চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত একই ধারায় প্রতিবাদী জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে বহুস্থানে ছিল শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় সমর্থন।

পরিশেষে আরো একটি কথা বলা দরকার যে জনাব বার্নিক অনেক ক্ষেত্রে তার বক্তব্যের তথ্যসূত্র বা উৎস উল্লেখ করেন নি। সঠিক ইতিহাস রচনার প্রথাসিদ্ধ নিয়ম সূত্র উল্লেখ। বিশেষ করে যেখানে বিতর্ক বা ভিন্নমতের অবকাশ থাকে সেখানে তো এ নিয়ম অবশ্যপালনীয়। তার বইতে একাধিক সংগ্রাম কমিটির নামতালিকায় সূত্র ও উৎস উল্লেখ করা হয় নি। আর সেই সদস্য তালিকার নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং কারো কারো রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। পূর্বাপর আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তমদ্দুন মজলিসের সদস্য ছিলেন এমন উদ্ভট তথ্য অবশ্যই হাস্যকর এবং তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

গোটা বইটিতে এমন অনেক তথ্য বা বক্তব্য রয়েছে যা নিয়ে প্রতিবাদ, বিতর্ক বা ভিন্নমত উঠে আসবে। এবং সেসব তথ্য পাঠকের পক্ষে ইতিহাসের সত্য হিসেবে গ্রহণ করার কথা নয়।

ইতিহাসের পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে আন্দোলন, সংগ্রাম, মুক্তিসংগ্রাম এবং বিপ্লবের ঘটনাবলীতেও বিকৃতি এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যা বিশ্ব ইতিহাসে নানা সময়ে দেখা গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐসব বিভ্রান্তিকর প্রচেষ্টা টেকেনি। জয় হয়েছে সত্য ইতিহাসেরই। তবু কেউ কেউ ইতিহাসের এ সত্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তাদের সাধ, সাধ্য ও বিশ্বাস মতো বিভ্রান্তিকর ইতিহাস লেখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ভাষা-আন্দোলন এই ঐতিহাসিক ধারার ব্যতিক্রম হবে কেন।

ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৯৪৭ আন্দোলনের তাত্ত্বিক পর্যায়ে এবং ১৯৪৮ মার্চের সাংগঠনিক তৎপরতার পর্যায়ে অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের পাশাপাশি তমদ্দুন মজলিসের ছিল বিশেষ ভূমিকা। ১৯৪৮ পরবর্তী প্রস্তুতিপর্বে অর্থাৎ প্রাকবাহান্ন পর্বে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা ক্রমশ কমে বিস্ফোরক একুশে পর্বে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। হাতে গোনা দু'একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বায়ান্নর আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের নাম ধরে রাখে। এবং তা ঢাকার বাইরে।

অন্যদিকে বাহান্নর আন্দোলন পরিচালনায় নেতৃস্থানীয়দের অধিকাংশই ছিলেন বামরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত যে কথা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে। বিশে ফেব্রুয়ারি আরোপিত ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতা এবং তাদের অনুসারী ছাত্রলীগ নেতৃত্বের প্রধান অংশ ভিন্নমত পোষণ করার কারণে তারা আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য তারা আন্দোলনে শামিল হন। এটাই একুশের বাস্তবতা।

ভাষা-আন্দোলনে
কমিউনিস্ট পার্টি ও তার গণসংগঠন

পাকশাসকগোষ্ঠীর কমিউনিস্ট বিরূপতা ও কঠোর দমননীতি

সাতচল্লিশ আগস্টে দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টিও ১৯৪৮-উত্তর সময়ে বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে দুই স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সম্ভবত পাকিস্তানি শাসনের মতিগতির কারণে সাজ্জাদ জহীরকে সেক্রেটারি করে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় পার্টির কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবু নেহাৎ নিয়মরক্ষার খাতিরে 'প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি' (পিওসি) নাম নিয়ে ভিন্ন এক রাজনৈতিক পরিবেশে পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রা শুরু। নিজের মত করেই শুরু। পশ্চিম পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো প্রকাশ্য তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না।

এদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কমিউনিস্টদের প্রতি মুসলিম লীগ শাসকদের হিংস্র, নির্যাতনমূলক সাম্প্রদায়িক নীতি, সর্বোপরি তাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষী আচরণ হিন্দু কমিউনিস্ট নেতাকর্মী অনেককে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে। ফলে পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অন্ধ পাকিস্তানপ্রীতি ও ধর্ম-সাম্প্রদায়িক মনোভাব সেসময় নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিক্ষিতশ্রেণির মধ্যেও এমন মনোভাব নেহাৎ কম ছিল না। ছিল কিছু সংখ্যক ছাত্রের মধ্যেও। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলছি।

এ অবস্থায় দুর্বল পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো তো দূরের কথা, অস্তিত্বরক্ষাই ছিল এক ধরনের লড়াই। তবু আদর্শগত বিশ্বাস ও মনোবল তাদের টিকে থাকতে সাহায্য করে। তাদের গণসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষেও কোনো প্রকার সঙ্গত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ খুব সহজ ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলো সরকারি সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমণে নাজুক অবস্থায় পৌঁছে ছিল। তবে একথাও সত্য যে সমাজে বিরাজমান ধর্মীয় রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমান তরুণদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আগ্রহ তখন মোটামুটি জোর

পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের এলাকাগুলো আবার জেগে উঠতে থাকে। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় প্রচণ্ড সরকারি দমননীতি।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং কমিউনিস্ট বিদ্বেষ কতটা তীব্র ছিল ছোট দু'একটি ঘটনায় তার প্রমাণ মিলবে, যেমন মিলবে সরকারি উসকানিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। শেষোক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা কমবেশি আমাদের অনেকেরই।

দেশবিভাগের পরপরই পূর্ববঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা দেখা করে সঠিকপথে দেশশাসনের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ভবী ভোলে নি।

তাই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করা মোটেই সহজ ছিল না। মুসলিম লীগের রক্ষণশীল গ্রুপের অতি উৎসাহী সন্ত্রাসী তৎপরতা এর কারণ। তাছাড়া প্রশাসনিক তথা আমলাতান্ত্রিক বিরূপতা তো ছিলই। তাই আটচল্লিশের মার্চে কোর্টহাউস স্ট্রিট ও কাপ্তান বাজারে অবস্থিত কমিউনিস্ট পার্টির অফিস নির্বিবাদে মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিংবা করোনেশন পার্কে সভা শাহ আজিজদের দলবল ভেঙে দিয়েছে।

এর জন্য লীগ শাসনের স্বৈরচারিতা যেমন দায়ী ছিল তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির সাময়িক হঠকারী নীতিও সে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য তৎপরতার অসুবিধা সম্বন্ধে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেনঃ 'এ পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের ছিল না। কিন্তু অন্যান্য উপায়ে এবং নির্যাতনের মাধ্যমে পার্টির কাজে সর্বতোভাবে বাধা প্রদানের সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছিলেন ও সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে তাদের চেষ্টা ও উদ্যোগের ত্রুটি ছিল না' (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৮)।

এমন এক বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ছিল বাঙালি মুসলমানের তরুণ সমাজকে যতটা সম্ভব সমাজতান্ত্রিক আদর্শে প্রভাবিত করে সংগঠনে নিয়ে আসা। এদিক থেকে তারা অনেকটা সফল হয়েছিলেন। তাই দেখা গেছে পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িত থাকা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক উদারমনা রাজনৈতিক নেতা এবং বিশেষত বেশকিছু নেতৃস্থানীয় তরুণ মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের স্বৈরতান্ত্রিক দেশ পরিচালনা নিয়ে শংকিত হয়ে ওঠেন।

স্বভাবতই তাদের মধ্যে বিকল্প রাজনৈতিক ভাবনা দেখা দিতে থাকে। সে ভাবনার টানে সাতচল্লিশ জুনে ঢাকায় এসে কামরুদ্দীন আহমদ 'গণআজাদী লীগ' গঠন করেন। অন্যদিকে সেসময় কলকাতায় বসে শহীদুল্লাহ কায়সার, আতাউর রহমান ও আখলাকুর রহমানের মতো কয়েকজন প্রগতিবাদী যুবক পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক যুবসংগঠন তৈরির পরিকল্পনা করেন এবং দেশবিভাগের পর ঢাকায় এসে সমমনাদের নিয়ে সংগঠন তৈরির উদ্যোগ নেন।

প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গীয় নেতাদের নেপথ্য পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে সাতচল্লিশে গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান ঘটে নি এবং ১৯৫২ সালের সফল ভাষা-আন্দোলনের পর ঐ বছরই ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়। শেষ দুটো সংগঠন সবধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ তুলে ধরে। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এদের সাংগঠনিক শক্তির বিস্তার ঘটেছিল।

কিন্তু কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তেমন দূরদর্শিতার প্রকাশ ঘটে নি। দুর্বোধ্য কারণে এদিকটা অবহেলিত থেকে গেছে বা সাফল্য ধরা দেয় নি। তাই পার্টির কৃষক ফ্রন্ট তার ঐতিহ্য হারায়।

মতাদর্শগত রাজনীতির মধ্যে বিরোধ বা সংঘাত খুব স্বাভাবিক বিষয়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ বিচারে কমিউনিস্টদের প্রতি জাতীয়তাবাদীদের বিদ্বেষ-বিরূপতা তত্ত্বগত সত্যের রূপ নিতে দেখা গেছে যা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্য। কখনো কখনো এতে হিংস্র সহিংসতার প্রকাশ ঘটে থাকে। মুসোলিনির ইতালি ও নাৎসি জার্মানি মনে হয় এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বিভাগোত্তর ভারত ও পাকিস্তান এদিক থেকে তাদের মতো করে উদাহরণ তৈরি করেছে। একদা সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্বকাল এদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়। তবে একথাও ঠিক যে আটচল্লিশে কমিউনিস্ট পার্টির হঠকারী সংগ্রামের নীতি, বিপ্লবের স্বপ্ন এবং 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' স্লোগান শাসকগোষ্ঠীকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছিল।

ঝুটা আজাদির স্লোগান সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তা সময়োপযোগী ও বাস্তবতাসম্মত ছিল না। 'ক্ষমতার হস্তান্তর' কথাটা যত সত্যই হোক সাধারণ

মানুষের চোখে বিদেশী শাসনের অবসান বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার প্রতীকরূপেই বিবেচিত হয়েছে। আর পাকিস্তানে ঐ স্বাধীনতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল পশ্চাদপদ মুসলমান জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র বাসভূমির স্বপ্ন। তাই অপ্রিয় সত্য ঐ স্লোগান কী ভারতে কী পাকিস্তানে মানুষ গ্রহণ করে নি।

তবে ঐ স্বাধীনতা যে সদর্থে সর্বশ্রেণির মানুষের নয় তা বুঝতে সাধারণ মানুষের অনেক সময় লেগেছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির উৎসব-অনুষ্ঠানে বিভিন্নশ্রেণির ভারতীয় নাগরিকের প্রতিক্রিয়ায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিল। বিশেষ বিশেষ প্রচার মাধ্যমে এমন প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ছিল অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। অবশ্য পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে এ ধরনের বোধোদয়, বলা যায় স্বপ্নভঙ্গের হতাশা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির এবং তেমন ভাবনায় পৌঁছাতে পাকিস্তানি বাঙালি মুসলমানের দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয় নি।

ভূস্বামী, শিল্পপতি ও উচ্চবিত্ত-বুদ্ধিজীবী-প্রধান পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের রাজনৈতিক শ্রেণি চরিত্রের পরিচয় দিতে মোটেই দেরি করে নি। তাদের বাঙালি-বিরূপতা ও বৈষম্যমূলক শাসননীতি দেশবিভাগের কিছু সময় পরেই পূর্ববঙ্গীয় ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের একাংশে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। তাদের বুঝতে খুব দেরি হয় নি যে পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্রভুবনের অমৃত তাদের জন্য নয়, সেটা অবাঙালি প্রধান শাসকগোষ্ঠী ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট।

কিন্তু এরা তখন সমাজের খুবই ছোট অংশ। সাধারণ মানুষ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিতশ্রেণি তখনো পাকিস্তানের স্বপ্নে আচ্ছন্ন। কমিউনিস্ট মতাদর্শে প্রভাবিত সীমিত সংখ্যক ছাত্রযুবার পক্ষে এককভাবে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা সম্ভব ছিল না। সরকারি জুলুম ও নির্যাতনের মুখে কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমজীবী শ্রেণি যেমন কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, মৎস্যজীবীদের সংগঠনগুলোর অবস্থাও ছিল খুব নাজুক যেকথা আগে বলা হয়েছে।

একই কারণে কমিউনিস্ট পার্টির মূল সংগঠনকেও আত্মগোপনে থেকে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে। এদের গণসংগঠন ও ছাত্রযুব সংগঠন চেষ্টা করেছে জাতীয় স্বার্থের আন্দোলনে যুক্ত থেকে পায়ের নিচে জমি তৈরি করতে।

প্রতিকূল পরিবেশেও আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টি

এ অবস্থার মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্রজনতার সব ধরনের দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলনে পরোক্ষভাবে সামিল থেকেছে তাদের সমর্থক ছাত্রযুবা,

শ্রমজীবী নেতাকর্মী ও নির্ভরযোগ্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে। চেষ্টা করেছে যাতে আন্দোলন সঠিকপথে পরিচালিত হয়। আন্দোলনের স্বার্থে এবং উল্লিখিত কারণে তারা নীতিগতভাবে সর্বদলীয় নেতৃত্ব গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বিশেষ করে আরো এ কারণে যে কমিউনিস্ট বিদ্বেষী মুসলিম লীগ সরকার যাতে আন্দোলনের সব দায় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর চাপিয়ে নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। ভাষার মত একটি সর্বজনীন বিষয়ের আন্দোলনেও কমিউনিস্ট পার্টি একই নীতি অনুসরণ করেছে। কিন্তু ডানপন্থী দলগুলোর কমিউনিস্ট বিদ্বেষের কারণে আন্দোলনের ঐক্য ও সফলতা ব্যাহত হয়েছে। আর সরকারি অপপ্রচারও থেমে থাকে নি। তারা কমিউনিস্ট পার্টি ও কথিত ভারতীয় চরদের এ জন্য দায়ী করেছে।

এ বিষয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন: 'পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি না থাকলেও সব ধরনের সরকারি নির্যাতনের ফলে পার্টি সংগঠনের পক্ষে খোলাখুলি কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।...এই অচলাবস্থার কিছুটা অবসান ঘটে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান ঘটে নি সংগঠিত হওয়ার পর' (প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৪-১৫)।

অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রে এতোটা সমস্যা ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত সমস্যা সংকট সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে নি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রকাশ্যে বা আত্মগোপন অবস্থায় তারা ঠিকই আন্দোলনে থেকেছে, আন্দোলনে সঠিক প্রভাব রাখারও চেষ্টা করেছে। সরকার-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং রাখার স্বার্থে ছাড় দিতেও পিছপা হয় নি। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অটুট রেখে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে শক্তিশালী করা। সাতচল্লিশ থেকে বাহান্ন পর্যন্ত ভাষার দাবিতে সংঘটিত বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি এই নীতিই অনুসরণ করেছে, নিজস্ব মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে নি। সেসময়, এমনকি এর পরেও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনে তাদের সংশ্লিষ্টতা ও তৎপরতা বজায় রেখেছে।

দুই

মুসলিম লীগ শাসনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি দমননীতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অবিশ্বাস্যমাত্রার নির্যাতন, জেল, জুলুমের নীতির মধ্যেও

কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক তৎপরতা কেমন ছিল তার একটা তথ্যচিত্র তুলে ধরতে পূর্বোক্ত কয়েক পৃষ্ঠার বক্তব্য উপস্থাপন। ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম স্লোগান ছিল 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই'। কারা ছিলেন তখন রাজবন্দি? হিসাব নিতে গেলে দেখা যাবে প্রাক-বাহান্নপর্বে তাদের প্রায় সবাই কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের গণসংগঠনগুলোর নেতাকর্মী। ডান বা মধ্যপন্থী গণতন্ত্রী রাজনৈতিক নেতাদের তখন জেলের খুপরিতে বড় একটা ঢুকতে হয় নি। এমন কি ভাষা-আন্দোলনের কথিত 'জনক' আবুল কাসেমকেও ঢুকতে হয় নি। তবে জাতীয়তাবাদী নেতাদের কেউ কেউ, যেমন ভাসানী, শেখ মুজিব প্রমুখ নেতাদের কারাবন্দি হওয়াটা ছিল নিয়মিত ঘটনা।

সরকার বনাম কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যান্য সংগঠন বনাম কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক সম্পর্কে যে জটিলতা, সমস্যা সংকট– সেই পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন বা অভিযোগ ভাষা-আন্দোলনের উপলক্ষে উঠেছিল। উপরে উল্লিখিত বক্তব্যের অনুধাবনে সেগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা মিলবে। আন্দোলনের স্বার্থ-বিষয়ক তাদের নীতি ও কৌশলের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আরো ব্যাখ্যা মিলবে পরবর্তী আলোচনায়।

ভাষা-আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব থেকে শেষ অবধি কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার অতিসংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপরে তুলে ধরা হয়েছে। আরো বিবরণ মিলবে পরবর্তী আলোচনায়, দেখা যাবে 'ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে। এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশিত 'ভাষা-আন্দোলনের দলিল সংকলন'-এ সংকলক লিখেছেন: 'প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপজ্জনক রাজনৈতিক শক্তি বিবেচনা করে এবং পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও দমননীতি জোরদার করে। এ অবস্থাতেও পার্টি ১৯৪৮ প্রথম পর্যায়ের ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১১ই মার্চ '৪৮-এ অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলার সাধারণ ধর্মঘট সফল করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা সর্বত্র সাধ্যমত অংশগ্রহণ করে। সেসময় প্রখ্যাত কমিউনিস্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্তও গ্রেপ্তারবরণ করেন' (শেখর দত্ত)।

শুধু রণেশ দাশগুপ্ত নন, পার্টি সদস্য বা সমর্থক মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, ইমাদুল্লাহ, দেওয়ান মাহবুব আলী, আবদুস সামাদ, মাহবুব জামাল জাহেদী, কে.জি মোস্তফা এবং এর দ্বিতীয় সারির আরো অনেক ছাত্র, যুব নেতা

ভাষা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ঢাকার বাইরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মীরা আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। বিপরীত মতাদর্শের নেতাকর্মীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কখনো আন্দোলনে সরাসরি অংশ নিয়েছেন। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত 'ভাষা-আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস'-এ তেমন প্রমাণ পাওয়া যাবে।

ঢাকার বাইরে শহরগুলোতে তাঁতশ্রমিক, সুতাশ্রমিক, বিড়িশ্রমিক তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা-আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাতে শক্তি সঞ্চার করেছেন। ভাষাআন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করতে পূর্ববঙ্গীয় কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

ভাষা-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির বিচার ব্যাখ্যায় কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যেমন আন্দোলনে ও আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ বজায় রাখা তেমনি এককভাবে বাঙালি জাত্যভিমানকে প্রাধান্য না দেওয়া, আন্দোলনের যৌথ নেতৃত্ব ও সর্বদলীয় চরিত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ অর্থাৎ সরকার-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির ঐক্য নিশ্চিত করা। সেই সঙ্গে বাঙালি-অবাঙালি সংঘাত প্রতিহত করার মাধ্যমে সরকারকে আক্রমণের যুক্তি এগিয়ে না দিয়ে সুস্থ পরিবেশ রক্ষার চেষ্টাও তাদের লক্ষ্য ছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণা ও তৎপরতার বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। প্রাথমিক লক্ষ্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম। সমাজতন্ত্র তখন দূর অস্ত্।

আন্দোলন শুরুর আগে থেকেই এবং আন্দোলনের সময় এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশিত সার্কুলারে ও তাদের প্রচারিত কয়েকটি বিবৃতিতে উল্লিখিত গণতান্ত্রিক নীতির প্রকাশ ঘটেছে। সকল ভাষার সমান অধিকারের বিষয়টি কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম বিশেষ গুরুত্বে তুলে ধরেছিল। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ২৭ জানুয়ারির বক্তব্যের প্রতিবাদে 'পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি ২০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য বিবৃতিতে জানায়: 'পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ভাষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির উপরই পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতি ও সংহতি নির্ভর করে।...কিন্তু লীগ সরকার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে চালু করার চেষ্টা করিয়া বাঙালির অধিকার ও কৃষ্টির উপরই

আক্রমণ করিতেছেন। ইহাতে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হইবে। তাই 'বাংলাকে' অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও সকল ভাষার সমমর্যাদা দান'– পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী ব্যক্তির দাবী। এই দাবীর পিছনে বাঙালি-অবাঙালি সকল জনসাধারণকে সমবেত হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।' (দলিল সংকলন, প্রাগুক্ত)।

আন্দোলনের আরো একটি দূরদর্শী বাস্তব দিক সম্পর্কে ১১ ফেব্রুয়ারির (১৯৫২) সার্কুলারে পার্টিকর্মীদের উদ্দেশে বলা হয়: 'আন্দোলন এখনও পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এখনও প্রধানত শহরে ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে।...পাকিস্তানের মজুর ও কৃষকশ্রেণি যাহাতে এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আন্দোলনকে সঠিক পথে নিয়া যাওয়ার জন্য আগাইয়া আসিতে পারে, তার জন্য আমাদের পার্টির তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার।

'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণির প্রতিনিধি লইয়া জেলায় জেলায় স্থায়ীভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠন করুন। সর্বদলীয় কমিটির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রচার, সাধারণ ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করার ব্যবস্থা করুন। ২১শে ফেব্রুয়ারি গ্রামাঞ্চলের বাজার গুলিতেও যাহাতে হরতাল পালিত হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন।

'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উস্কানি সত্ত্বেও ২১শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ সভা ও শোভাযাত্রা যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে চলে, সেদিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন' (দলিল সংকলন, প্রাগুক্ত)। এরপরও যদি অভিযোগ ওঠে যে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনে কোনো ভূমিকা রাখেনি বা আন্দোলনে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে তবে তা যুক্তির ধোপে টেকে না।

সার্কুলারে উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে আন্দোলন যাতে সর্বদলীয় নেতৃত্বে ও সর্বদলীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালিত হয় সেটাই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত অবস্থান। এবং সে অবস্থান থেকেই তাদের সদস্য, সমর্থক সমমনা ছাত্র যুব নেতৃত্বের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা করেছে আত্মগোপনে থাকা কমিউনিস্ট পার্টি। এ প্রসঙ্গে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

আহ্বান ছিল আন্দোলনে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণিকে যুক্ত করা যাতে আন্দোলন ব্যাপক গণভিত্তি অর্জন করতে পারে।

কিন্তু বহুদলীয় নেতৃত্বে নানামতের টানাপোড়েনের কারণে ঐ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি যথাযথ গুরুত্ব পায় নি। আবদুল মতিনের বক্তব্যে জানা যায়, রাষ্ট্রভাষা বাংলার একক দাবির সঙ্গে জনস্বার্থভিত্তিক কর্মসূচি যুক্ত করে স্তিমিত আন্দোলনকে জনসংশ্লিষ্টতায় উজ্জীবিত করার জন্য তার প্রস্তাব বারবারই উপেক্ষিত হয়েছে। আর সে কারণে একুশের আন্দোলন ২২ তারিখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণআন্দোলনে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও সপ্তাহকাল পরেই তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে এবং মার্চের প্রথমদিকেই ঢাকায় আন্দোলনের সমাপ্তি। অবশ্য সে সময় ঢাকার বাইরে শহরগুলোতে আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলেছে।

আটচল্লিশের অন্দোলনপর্ব থেকে প্রধানত তমদ্দুন মজলিসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব, বিশেষ করে মজলিস-প্রধান অধ্যাপক আবুল কাসেমের কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের উদাহরণ নেহাৎ কম নয়। এমনকি অনেক পরে তার স্মৃতিচারণেও লেখা হয়েছে যে ভাষা-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ করে নি। আবার স্ববিরোধী এমন মন্তব্যও রয়েছে যে অতিউৎসাহী বামপন্থীদের জন্য আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সরকার নির্যাতন ও দমননীতির সুযোগ পেয়েছে।

এ ধরনের বক্তব্যে ছিল অযৌক্তিক একদেশদর্শিতা, মতাদর্শগত কারণে নিছক অর্থহীন কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন, যা তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক সূত্রে বলা হয়েছে, যেমন কমরেড মুজফফর আহমদ সম্পর্কে অধ্যাপক কাসেমের বক্তব্যের জবাবে প্রথমোক্ত জনের প্রতিবাদী বক্তব্য। সে ঘটনা আটচল্লিশ সালে।

বায়ান্নে পৌঁছে আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বের কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতার পরিচয় মেলে ফেব্রুয়ারি ২ তারিখের বিবৃতি ও ১১ তারিখের সার্কুলারে। আন্দোলন ফলপ্রসূ করে তুলতে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদলীয় সংগঠন তৈরির লক্ষ্য নিয়ে নেপথ্যে থেকেও সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেকথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

আন্দোলনে ঘটে নি ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ী ভূমিকা

পূর্বোক্ত দলিল সংকলনের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সংগঠনগতভাবে সে চেষ্টা চলে যুবলীগের মাধ্যমে। প্রসঙ্গত আরো বলা

হয়েছে: 'যুবলীগ প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। যুবলীগের বৈঠকে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তীতে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে তা পরিচালনার ক্ষেত্রে যুবলীগের প্রতিনিধি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, সমর্থকরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।'

এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন: '১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলন যারা সক্রিয়ভাবে পরিচালনার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তারা সকলেই তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য অথবা সমর্থক হিসেবে তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তাদের আন্দোলনগত চিন্তাধারা ও লাইন উপরোক্ত সার্কুলারের লাইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল' (প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫০)।

জনাব উমর কমিউনিস্ট পার্টির ১১ ফেব্রুয়ারির সার্কুলারে পরিবেশিত বক্তব্যের ভিত্তিতে উপরের কথাগুলো বলেছেন। আমাদের অভিজ্ঞতাও বলে, একুশের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে ছাত্র আন্দোলন এবং পরদিন (২২ ফেব্রুয়ারি) থেকে গণআন্দোলনে পরিণত হলেও একে সাংগঠনিকভাবে ধারণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যুবলীগের প্রধান ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। যুবলীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুস সামাদ, মোহাম্মদ সুলতান থেকে তরুণ যুবলীগ কর্মী আনিসুজ্জামান, আহমদ হোসেন, নেয়ামাল বশীর প্রমুখ নেতাকর্মীদের সার্বক্ষণিক তৎপরতায় বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জনাব উমর ঠিকই বলেছেন যে 'সাংগঠনিক ভাবে যুবলীগই তখন বিরোধী সংগঠনগুলির মধ্যে সব থেকে সুশৃংখল ও শক্তিশালী ছিল' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২)। শুধু ঢাকাতেই নয় দেশের প্রধান শহরগুলোতে বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনে যুবলীগের নেতাকর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা অন্য সব সংগঠনের চেয়ে বেশিই ছিল, অবশ্য দু'একক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বাদে। তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন: 'আওয়ামী মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রধান হলেও তখনো পর্যন্ত তার সাংগঠনিক শক্তি তেমন উল্লেখযোগ্য মাত্রার ছিল না এবং কর্মীসংখ্যাও ছিল অল্প। মুসলিম ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী ছাত্রসংগঠন হলেও যুবলীগের তুলনায় তার সাংগঠনিক শক্তি এবং উদ্যোগও কম ছিল' (পৃ. ২৯২)।

পূর্বোক্ত বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় জনাব উমর আন্দোলনে যুবলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন 'তারা (অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি) যুবলীগের মধ্যে নিজেদের কিছু কর্মীকে সক্রিয় করে তাদের মাধ্যমে গণসংযোগ স্থাপনের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে যথেষ্ট সাফল্যও এই পর্যায়ে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।' এ বক্তব্যের সঙ্গে যোগ করা চলে যে অচল ছাত্র ফেডারেশনের বিকল্প হিসেবে ছাত্রযুব শক্তিকে কমিউনিস্ট পার্টিই যুবলীগে সাংগঠনিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং যুবলীগের মূল নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের পরিচয় নিতে গেলে তাদের বামপন্থী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আর সেজন্যই উমরের মতে '১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা-আন্দোলন যখন নতুন করে শুরু হলো তখন সাংগঠনিকভাবে যুবলীগের প্রভাবই সাধারণ ছাত্র যুবকদের মধ্যে বেশি দেখা গেল এবং এই প্রভাব আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরবর্তীকালে যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করলো।' (পৃ. ৪৯৩)। অবশ্য এ প্রসঙ্গে হল-হোস্টেল তথা ছাত্রাবাসগুলোর নেতাকর্মী ও রাজনীতি সচেতন ছাত্রসমাজের ভূমিকাও বিবেচনার দাবি রাখে যা উমর উল্লেখ করেন নি। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

একুশের আন্দোলনে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে সার্বিক মূল্যায়ন শেষে কমিউনিস্ট পার্টি প্রসঙ্গে জনাব উমরের মন্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ নেই। তার মতে 'যে ভাবেই দেখা যাক, একথা অনস্বীকার্য যে ২০ তারিখ রাত্রি থেকে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র ও যুবলীগ কর্মীরাই সাংগঠনিকভাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন' (পৃ. ৪৯৩)। বামপন্থী ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, এরাই ছিল আন্দোলনের চাবিকাঠি। অন্যদের দোদুল্যমানতা এদের মধ্যে ছিল না।

বিশ তারিখের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একুশের কর্মসূচি বানচাল করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করে একুশের কর্মসূচি পালন নিয়ে সে রাতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে দুই বিপরীতমুখী ভিন্নমত। অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও গোলাম মাওলা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে থাকলেও উপস্থিত বাকি সদস্য অর্থাৎ সব রাজনৈতিক দল ও

ছাত্রলীগ ও সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র প্রতিনিধিগণ ১৪৪ ধারা অমান্য করার বিরুদ্ধে ভোট দেন।

কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রাবাসের রাজনীতি-সচেতন ছাত্র এবং বামপন্থী ছাত্রনেতা ও কর্মীদের ক্ষুব্ধ অবস্থান ছিল ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে। যেজন্য ভোটে জয়ী হয়েও সংগ্রাম পরিষদের মূল নেতাদের পরদিন অনুষ্ঠিতব্য সভায় ছাত্রজনমতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সে রাতে হল-হোস্টেলে যেসব ছাত্রনেতা ও কর্মী ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে ছাত্রজনতা সংগঠিত করেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন যুবলীগের সদস্য অথবা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থক।

উদাহরণ হিসেবে ইমাদুল্লাহ, অলি আহাদ, আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, মোহাম্মদ সুলতান, গাজিউল হক, আনোয়ারুল হক খান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মোশারফ চৌধুরী, কমরুদ্দীন শহুদ, হাবিবুর রহমান শেলী, হাসান হাফিজুর রহমান, কে. জি. মোস্তফা, এস.এ.বারী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়া আরো অনেকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেডিকেল কলেজের ছাত্র আলী আজমল, মঞ্জুর হোসেন, মোহাম্মদ জাহেদ, ফজলুল করিম, নওয়াব হোসেন, শরফুদ্দিন আহমদ, আহমেদ কবির, ফজলে রাব্বি, ফজলুল করিম শাহ প্রধান, আলিম চৌধুরী, আবদুস সালাম, মহিউদ্দিন খান প্রমুখ ও লেখক নিজে। তরুণদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলমগীর, কবিরউদ্দিন, মাহমুদ, মানাফ, আবদুল মান্নান প্রমুখ। জগন্নাথ কলেজের ছাত্রনেতা মৃণালকান্তি বাড়ৈ এবং তরুণ ছাত্রকর্মী আনিসুজ্জামানদের কথা আগেই বলা হয়েছে। এক কথায় বায়ান্নর আন্দোলনে কমিউনিস্ট আদর্শে প্রভাবিত ছাত্রযুবা সাংগঠনিক ও তাৎক্ষণিক তৎপরতায় সর্বাধিক অবদান রেখেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের বিচারব্যাখ্যা

প্রসঙ্গত একটি ঘটনা উল্লেখের দাবি রাখে। বিশে ফেব্রুয়ারি রাতে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের দায়িত্বে থাকা নেতা শহীদুল্লাহ কায়সার মেডিকেল হোস্টেলে আমার কক্ষে এসেছিলেন ১৪৪ ধারা অমান্য করা সম্পর্কে ছাত্রদের অভিমত জানতে। সে যাত্রায় তিনি ঢাকা হল এবং ফজলুল হক হলেও গিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদলীয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ ও বিভক্তির পক্ষে ছিল না। যে কারণে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। কিন্তু ছাত্রসমাজের মনোভাব যাচাই-এর পর তাদেরও মত পাল্টায়। পাল্টায় সমস্যার সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে।

এ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য খোকা রায় পরবর্তী সময়ে লিখেছেন: 'বিশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর পার্টির কয়েকজন আন্ডারগ্রাউন্ড প্রাদেশিক নেতা ও পার্টির যুব, ছাত্র নেতাদের এক বৈঠক হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর সে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ২১ তারিখ ছাত্রমিছিল করার জন্য একটি প্রস্তাব পার্টির ছাত্র নেতাদের পক্ষ থেকে পরের দিন ছাত্র সমাবেশে উত্থাপন করা হবে। সে প্রস্তাব সম্পর্কে ঐ ছাত্র সমাবেশ যে রায় দেবে পার্টির সব সভ্য ও কর্মী তা মেনে চলবে' (সংগ্রামের তিন দশক, পৃ: ১১৬)।

১৪৪ ধারা অমান্য করা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে কেউ কেউ ভিন্ন কথা বলেছিলেন বলেই সংশ্লিষ্টদের মতামত তুলে ধরতে হচ্ছে। মোহাম্মদ তোয়াহা ২০ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে তার ভোটদানে বিরত থাকা এবং ১৪৪ ধারা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মতামত সম্পর্কে একুশের সংকলনে (১৯৮০) লিখেছেন, 'সেদিন কার কি ভূমিকা এ নিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। সত্য ঘটনা হলো আমি ছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি, আর অলি আহাদ মেম্বার। সেখানে বেশ জোর দিয়েই সেদিন আমি বলেছিলাম যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা না হলে আর এক কদমও এগুনো যাবে না।...'সেসময় আমি অপেক্ষা করছিলাম আমাদের পার্টির 'কোনো নির্দেশ আমার কাছে আসে কি না। কিন্তু পার্টির পক্ষ থেকে সেদিন কোনো নির্দেশ আমার কাছে আসে নি। এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছিল যে, সামনে নির্বাচন– এ সময় যদি গোলযোগ হয় তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেবে। এজন্যই নাকি কমিউনিস্ট পার্টি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।' বিশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শহীদুল্লাহ কায়সারের সঙ্গে আমার স্পষ্ট কথা হয় যে মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল, এফ. এইচ হলের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙতে এক পায়ে খাড়া, তেমনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা। একথা শুনে শহীদুল্লাহ (তালেব ভাই) মনে হয় কিছুটা চিন্তামুক্ত হয়ে বেরিয়ে যান। এখন প্রশ্নঃ

তাহলে কেন মোহাম্মদ তোয়াহার কাছে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নির্দেশ আসে নি। হতে পারে তারা সেদিন রাত পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তার কারণ পার্টি প্রথম থেকেই আন্দোলন শক্তিশালী করতে সর্বদলীয় ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, এমনকি সলিমুল্লাহ হলের প্রতিনিধিও (ভি.পি ও

জি.এস) ১৪৪ ধারা ভাঙার বিরুদ্ধে, তাই আত্মগোপনকারী পার্টির পক্ষে তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। শহীদুল্লাহ কায়সারের ছাত্রাবাসে এসে মত যাচাই করা থেকে তা বোঝা যায়। তাই সে মুহূর্তে বৈঠকে নিজেদের মত প্রকাশ করে সর্বদলীয় পরিষদে বিভক্তির দায় নিতে বা কারণ হতে চায় নি কমিউনিস্ট পার্টি। গোটা বিষয়টা সাধারণ ছাত্রদের মতামতের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন তারা। এমনটাই আমার ধারণা।

এ বিষয়ে বদরুদ্দীন উমর বলেছেন, 'বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে ছাত্রদের সংগ্রামকে তারা জনগণের সামগ্রিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল। এটাই ছিল অন্যতম কারণ যার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শুধু ছাত্রদের উপর নির্ভর করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষপাতি ছিল না। তবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য যখন বদ্ধপরিকর হলো এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সেই অনুযায়ী একের পর এক পদক্ষেপগুলি নিতে শুরু করলো তখন কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে সর্বতোভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিল'। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৯৪)।

বিষয়টি কমিউনিস্ট পার্টির ভাষা-আন্দোলন-বিষয়ক পর্যালোচনা দলিলে যুক্তি ও কারণসহ আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেখানে আত্মসমালোচনাসহ বলা হয়ঃ 'এই আন্দোলন যে এত তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারে তাহা পার্টি নেতৃত্ব বুঝিতে পারে নাই।...এই কারণেই ২০ তারিখ ১৪৪ ধারা জারি হওয়ার পর কি কর্তব্য হইবে এই সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ না দিয়া সেদিন পার্টি নেতৃত্ব কমরেডদের শুধু বলিয়াছিলেন যে, ২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র জমায়েত করিয়া সেখানে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক এবং কমরেডরা যেনো সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া নেন।

'অবশ্য ২১শে তাং ছাত্রদের মনোভাব সঠিকভাবে বুঝিতে পারিয়া কমরেডরা বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেন যে ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও ১০ জন ১০ জন করিয়া মিছিল করা দরকার। তাদের এই সঠিক সিদ্ধান্তই সমস্ত আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া দেয়' (দলিলপত্র, পৃ. ৩৯)।

কমিউনিস্ট পার্টির এ বক্তব্য যে যথাযথ তার প্রমাণ প্রগতিবাদী ছাত্র নেতৃত্বের উদ্যোগে আমতলার সভায় দশজনার ছোট ছোট মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং রাজনীতি সচেতন সাধারণ ছাত্রদের চাপে সে সিদ্ধান্ত আবেগ ও দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়নের চেষ্টা চলেছে। দশজনার মিছিল করার

উদ্দেশ্য ছিল শৃংখলার মধ্য দিয়ে ১৪৪ ধারা অমান্যের কাজ সম্পন্ন করা। প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা দরকার যে দীর্ঘসময় আত্মগোপনে থাকা কোনো পার্টির পক্ষে জনচেতনা সঠিকভাবে যাচাই করা সহজ নয়। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি শেষমুহূর্তে হলেও নীতিগতভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে একুশের আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালনা করতে পেরেছিল।

উল্লেখ করা দরকার যে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সবাই জানেন যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব এবং তার বন্ধু খালেক নেওয়াজ খান, সলিমুল্লাহ হলের জি.এস. হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, ভি.পি মুজিবুর হক, এস.এম নুরুল আলম প্রমুখ ছাত্রনেতাদের অনেকে এবং রাজনৈতিক নেতারা তো বটেই ১৪৪ ধারা অমান্যের বিরোধিতা করেন– শুধু ২০ তারিখের বৈঠকেই নয়, ২১ তারিখে সকালে আমতলার সভায়ও। সব বাধা সত্ত্বেও সাধারণ ছাত্রদের দূরদর্শিতা, যুব লীগের নেতাকর্মীদের বিচক্ষণতার কারণে কমিউনিস্ট পার্টির নির্ধারিত সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে একুশের আন্দোলন ১৪৪ ধারা ভেঙে সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে যায়।

পূর্বোক্ত আরো একটি বিষয় অর্থাৎ নেতৃত্বের সর্বদলীয় চরিত্র বজায় রাখার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির অক্লান্ত চেষ্টা যেমন ঢাকায় অকার্যকর সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির বিচ্ছিন্ন, অদূরদর্শী পথ চলা সত্ত্বেও চলেছে, তেমনি ঢাকার বাইরেও আন্দোলনের জন্য সুফল বয়ে এনেছিল। এ বিষয়ে একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন বদরুদ্দীন উমর। তিনি লিখেছেন 'ঢাকার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একরকম হলেও ঢাকার বাইরে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির কর্তৃত্ব ছিল অনস্বীকার্য। সেখানে অনেক এলাকায় যুবলীগের কর্মীরা ছিলেন। কিন্তু তারা থাকলেও অন্যেরাও সক্রিয় ছিলেন এবং সর্বত্র অন্যদের প্রভাব ও নেতৃত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪)।

ঢাকায় ও অন্যত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব

পূর্বাপর আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে ঢাকায় ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয়পর্বের (১৯৫২) নেতৃত্বে যুবলীগ ও সমমনাদেরই প্রাধান্য, নেপথ্যে কমিউনিস্ট পার্টির যথাসাধ্য প্রচেষ্টা। ৩১ জানুয়ারিতে গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ মতভেদের দ্বন্দ্বে অকার্যকর হওয়ার কারণে মূল নেতৃত্ব থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ঢাকার বাইরে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন, সেখানে সর্বদলীয় পরিষদের প্রাধান্য। তবে ঐ পরিষদে যুবলীগের বাইরে বদরুদ্দীন উমর কথিত 'অন্যদের নেতৃত্বে'

যেমন ছিল কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্য বামপন্থী দল এবং নানা পেশার শ্রমিক ইউনিয়ন তেমনি কোথাও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ, কোথাওবা তমদ্দুন মজলিস। ঢাকায় সেসময় তমদ্দুন মজলিসের প্রভাব না থাকলেও দেশের অন্যত্র কোনো কোনো শহরে তাদের সংগঠন ছিল এবং তাদের নেতাকর্মীরা অন্যদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছেন।

ঢাকায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে নেতৃত্বের যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল তা পূরণ করে মেডিকেল ব্যারাকে গঠিত নতুন নেতৃত্ব। আর সে নেতৃত্বই একুশের আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। স্বভাবতই তাদের নাম ও রাজনৈতিক মতাদর্শগত পরিচয় ইতিহাস পাঠকের জানা দরকার। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাদের নামের সঙ্গেই তাদের রাজনৈতিক পরিচয় জড়িয়ে রয়েছে। যেমন অলি আহাদ, আবদুল মতিন, ইমাদুল্লাহ, মোহাম্মদ তোয়াহা, মাহবুব জামাল জাহেদী, মোহাম্মদ সুলতান, কে.জি. মোস্তফা, গাজীউল হক (২২ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য যারা একুশে সকালে ১৪৪ ধারা অমান্য করার দায়ে গ্রেফতার হয়ে ছিলেন (যেমন আবদুস সামাদ) তাদের নাম এ তালিকায় আসে নি। কারণ একুশ তারিখের পর থেকে আন্দোলন পরিচালনায় তাদের অনুপস্থিতি। কারা বন্দিদের মধ্যে আরো ছিলেন হাবিবুর রহমান শেলী, আলী আজমল, আনোয়ারুল হক খান, নেয়ামাল বশীর প্রমুখ।

আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে একুশে ফেব্রুয়ারি বিকেলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য শহীদুল্লাহ কায়সার মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গণে ছাত্রজমায়েতের পরবর্তী করণীয় বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন এবং পরবর্তী দু'তিন দিন হোস্টেলে থেকে সক্রিয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, ছাত্রকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। অবশ্য আত্মগোপনে থাকা কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে মিছিলে যোগ দেওয়া যে তার পক্ষে সম্ভব ছিল না সেকথা বলাই বাহুল্য। কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপনে থাকা দু'একজন জ্যেষ্ঠ নেতাও সন্ধ্যার পর হোস্টেলে এসে ছাত্রযুব নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। যেমন জ্ঞান চক্রবর্তী, সুনীল ঘোষ, খোকা রায় প্রমুখ।

উল্লিখিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় একুশের আন্দোলন কাদের নেতৃত্বে ও পরামর্শে পরিচালিত হয়েছিল তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও অধ্যাপক আবুল কাসেম কিসের ভিত্তিতে তার স্মৃতিচারণমূলক লেখায় (একুশের সংকলন ১৯৮০) বলতে পেরেছেন যে আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির

'কাজকে নেতৃত্বের শামিল করার মত মিথ্যা ও বেওকুফী আর কিছুই হইতে পারে না' (পৃ. ২৪) সে কথা বোঝা শক্ত। কারণ তার বক্তব্য কোনো তথ্য বা যুক্তির মধ্যে পড়ে না, ধোপে টেকে না। বাস্তব পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী যেখানে ভিন্ন কথা, বিপরীত কথা বলে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্যে রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতাই প্রকাশ পায়। হয়তো হতাশা ও ব্যর্থতা থেকে সত্যকে স্বীকার করতে না পারাই ছিল বিরূপতার কারণ। আর একথা সত্য যে একুশের ছাত্রজনতার গণআন্দোলন পরিচালনায় তমদ্দুন মজলিসের কোনো শীর্ষনেতাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যায় নি।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির 'ভাষা-আন্দোলনের পর্যালোচনা' শীর্ষক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে: 'এই আন্দোলনে সমগ্র পার্টিই যথাসাধ্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে। সমস্ত কমরেডরাই আন্দোলনের নেতৃত্বদানে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করিয়াছে।' ঢাকায় আন্দোলন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট মূল নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয় নিতে গেলে এ দাবি অগ্রাহ্য করা চলে না। একথা ঢাকার বাইরে অনেক ক্ষেত্রেই আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে সত্য।

আন্দোলন পরিচালনায় বা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমর্থক ছাত্রযুব নেতৃত্ব যে প্রধান ভূমিকা রেখেছে, বিশেষ করে বাহান্নর আন্দোলনে, সেকথা ইতিহাসসম্মত সত্য। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একুশের আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত প্রভাব যা আন্দোলনের দিকনির্দেশ করেছে। যেমন সর্বদলীয় নেতৃত্ব, পাকিস্তানের সব প্রাদেশিক ভাষার অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে। অবশ্য তাদের জনস্বার্থ বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছাত্রযুব নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

এছাড়া ছোটবড় একাধিক ঘটনায় আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন স্লোগান নির্ধারণে তেমনি ১৪৪ ধারা ভাঙার ক্ষেত্রে, তেমনি মার্চে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে। নানা কারণে স্তিমিত আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার জন্য শান্তিনগরে ৯ মার্চ ছাত্রযুব নেতৃত্বের যে বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয় তা ছিল পুরোপুরি কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টায়। সেখানেও সব মতাদর্শের নেতাদের ডাকা হয়েছিল, যেমন কাজী গোলাম মাহবুব থেকে হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, অলি আহাদ, তোয়াহা থেকে আবদুল মতিন। কিন্তু ভেতর থেকে বৈঠকের খবর পুলিশের কাছে পৌঁছে যাওয়ায় উপস্থিত সবাই গ্রেফতার হন। এ অভিযোগ অবশ্য মোহাম্মদ তোয়াহার।

ভাষা-আন্দোলনের মূল্যায়নে কমিউনিস্ট পার্টি আবেগের প্রশ্রয় দেয় নি। বরং যুক্তি ও স্থানীয় বাস্তবতার ভিত্তিতে আন্দোলনের পথ নির্দেশ করেছে। ভাষা-

আন্দোলন অর্থাৎ বায়ান্নর গণআন্দোলনকে 'জাতীয় সংগ্রাম' হিসেবে চিহ্নিত করেও তাদের পর্যালোচনায় এর দুর্বলতাগুলোও সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে। 'বিজয়ে'র উচ্ছ্বাসে ভেসে না গিয়ে তাই বলা হয়েছে 'ভাষা-আন্দোলনের ব্যাপকতার তুলনায়...সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল। সরকারি দমননীতির ফলে ও সংস্কারপন্থী নেতাদের পিছু হটার ফলে...কমিটিগুলি অনেকখানি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। সংগ্রামশীল নেতা ও কর্মীদের লইয়া ও মজুর কৃষকশ্রেণির প্রতিনিধি লইয়া কমিটিগুলি পুনর্গঠন করা বিশেষ প্রয়োজন' (পৃ. ৩৩)।

পর্যালোচনায় আন্দোলনের আরো একটি দুর্বলতা সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়েছিল যে আন্দোলনে ঢাকাই বাসিন্দাদের ব্যাপক সংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও মহল্লায় মহল্লায় আন্দোলনের কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না।

আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল ছাত্রাবাসগুলো। সরকার সেগুলো বন্ধ করে দিয়ে প্রচণ্ড দমননীতি চালানোর ফলে ঢাকায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। তাদের মতে আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা, এর মূল নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণি (পৃ.৪৪)। অর্থাৎ নেতৃত্বে শ্রমজীবী শ্রেণির প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকায় আন্দোলন আরো ব্যাপক ও আরো শক্তিশালী হতে পারে নি। দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

একথা ঠিক যে শ্রমজীবী শ্রেণির নেতৃত্বে আন্দোলন যদি গোটা দেশজুড়ে চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতো, তাতে নুরুল আমিন সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে উঠতো। দমননীতির সাহায্যে দেশব্যাপী বিস্তৃত আগুন ঝরা আন্দোলন স্তব্ধ করা সম্ভব হতো না। কমিউনিস্ট পার্টির নির্ধারিত সর্বশ্রেণির নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনা নীতি হিসেবে সঠিক মনে করার কোনো বিকল্প নেই।

এ বিষয়ে জনাব উমরের ভাষায় 'কমিউনিস্ট পার্টি সব ধরনের দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিল।... এই দৃষ্টিভঙ্গীই তৎকালে সঠিক ছিল কারণ শুধু বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে দেশব্যাপী জনগণের ঐক্য গড়ে তোলা এবং তাকে শক্তিশালী ও সংহত করা সম্ভব ছিল না' (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩)।

এমন চিন্তা আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট নেতাদের কারো কারো মধ্যে থাকলেও অধিকাংশই আপাতত সাফল্যে সন্তুষ্ট ছিলেন। আবার কেউ কেউ চান নি, আন্দোলন শ্রমজীবী নেতৃত্বে দেশময় আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মুঠোর বাইরে চলে যাক। এটাও সর্বদলীয় নেতৃত্বের একপ্রকার দুর্বলতা। সময়ের ও পরিস্থিতির দাবিতে অনেক সময় এ ধরনের দুর্বলতার কথা জেনেও

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থে সর্বদলীয় নেতৃত্বের পথ ধরতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টিও ঐ সীমাবদ্ধতার বিষয়টি জেনে বুঝেই সর্বদলীয় নেতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ছিল, অন্যরা সে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারে নি।

পরনির্ভরতায় নানামুখী সমালোচনার মুখে কমিউনিস্ট পার্টি

ভাষা-আন্দোলনের চরিত্রবিচার সম্পর্কে আলোচনায় ও আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্লিষ্টতা, ভূমিকা এবং এ বিষয়ে অন্যদের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আটচল্লিশের আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের কমিউনিস্ট-বিরোধী বাধা-বিপত্তি পার হয়ে ১৯৫২-র শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টি, তার গণসংগঠন যুবলীগ এবং সমর্থক প্রগতিশীল ছাত্রগণ যখন আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট তখন অন্তত ঢাকায় আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিসের বিশেষ কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে ইতিহাসেরও স্বীকৃত বিষয়। তা সত্ত্বেও অধ্যাপক আবুল কাসেমের ভক্তগণ কীভাবে তাকে 'ভাষা-আন্দোলনের জনক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা বুঝে ওঠা কঠিন।

যাই হোক ওটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের বক্তব্য, উপরে উল্লিখিত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এ আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় দ্বিধা, সংশয়ে ভোগার পক্ষে কোনো যুক্তি ছিল না।

দোদুল্যমানতা তা নয়ই। কিন্তু পার্টি তা করেছে এবং আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় নীতিগত সঠিক বিচার সত্ত্বেও রাজপথে, বাস্তব তৎপরতায় তেমনটাই করেছে। আমার বিশ্বাস আটচল্লিশের হঠকারী সশস্ত্র বিপ্লবের অতিবাম বিচ্যুতির প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট ডান ঝোঁক এবং উগ্র পাকদমননীতি এর কারণ। গণতান্ত্রিক সংগঠনের শক্তি ও জনসমর্থনের ওপর নির্ভর করে চলা তাদের সংগ্রামের নীতি হয়ে দাঁড়ায়। ঢাকা জেলা পার্টির হাতে লেখা 'আত্মসমালোচনা'মূলক রিপোর্ট পড়ে তাই মনে হয়েছিল।

এর ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ নির্ভরতার প্রকাশ দেখা যায় তাদের একাধিক কর্মকাণ্ডে। অথচ ভাষা-আন্দোলনের (১৯৫২) অনেকগুলো সঠিক সিদ্ধান্তের উৎস কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ নয়। যেখানে তাদের কিছু সর্বজনীন চরিত্রের সঠিক সিদ্ধান্ত ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে নি সেখানে আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিষয় গুলো পূর্বে আলোচিত, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন পড়ে না।

তবু অপ্রিয় কথাই বলব, আত্মবিশ্বাসে দুর্বল কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক ছাত্রজনতার শক্তির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে নি। গুরুত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ (অবশ্য সভাপতি ভাসানী ব্যতিক্রম) নেতা, ছাত্রলীগ নেতা, গণআজাদী লীগের প্রধান কামরুদ্দিন আহমদ, আবুল হাশিম প্রমুখের মতামতের ওপর। এটুকু বোঝা দরকার ছিল যে তারা ১৪৪ ধারা ভেঙে সরকারের সঙ্গে সংঘাতে যেতে চায় নি আসন্ন নির্বাচনের কথা ভেবে, সেখানে সংসদীয় আসন পাবার আশায়। মুসলিম লীগ আপাতদৃষ্টিতে তখন শক্তিশালী মনে হলেও তাদের পায়ের নিচে মাটি খুব শক্ত ছিল না। আর ছিল না বলেই বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের প্রভাবে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কয়েকটা বাদে প্রাদেশিক আইন সভার সব ক'টা আসন দখল করে নিয়েছিল শক্তিশালী মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী করে। ১৪৪ ধারা ভেঙে একুশের আন্দোলন না ঘটলে ঐ নির্বাচনী অঘটন সম্ভব হতো না। সবাই জানেন যুক্তফ্রন্ট গঠনের পেছনে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির পরিকল্পিত চেষ্টা। অথচ মৌলবাদীদের চাপে তাদেরই রাখা হয় নি ফ্রন্টে। ফ্রন্টের ভাঙন ঠেকাতে পার্টিই ফ্রন্ট থেকে সরে আসে। এসব পরের কথা।

প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচারী নুরুল আমীন সরকারই গুলিবর্ষণের মাধ্যমে ছাত্র-অছাত্রদের হত্যা করে ছাত্র আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করেছিল। স্বৈরশাসক, একনায়কী শাসকদের চরিত্র এমনই হয়ে থাকে। বিশ্বজুড়ে তার প্রমাণ ছড়ানো। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বিশ্বাস করি ১৪৪ ধারা জারির আগেও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে যে প্রতিবাদী উগ্রতা ও ঐক্য বিরাজ করছিল তাতে ক'দিন দেরিতে হলেও ভাষার পক্ষে গণআন্দোলন ঠিকই দেখা দিতো। যেমন ঢাকায় তেমনি ঢাকার বাইরে, বিশেষ করে একদা বাম সংগঠন ও আন্দোলন প্রভাবিত অঞ্চলগুলোতে। প্রতিক্রিয়ায় দেশের সর্বত্র জ্বলে উঠতো আগুন। রাজনৈতিক পর-নির্ভরতা কমিউনিস্ট পার্টিকে এসব বাস্তবতা ও আন্দোলন বিষয়ক অন্তর্নিহিত সত্য বুঝতে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

ভাষা-আন্দোলনের চরিত্র ছিল সর্বজনীন, বিষয়টা ভাষা বলে। যেজন্য নানা মতাদর্শের সদস্য এখানে এসে জড়ো হয়েছিল। তবু আন্দোলনের নেতৃত্বে অন্তর্দ্বন্দ্ব কম ছিল না। আমরা যারা আন্দোলনের ভেতর বাহির দুটোই কাছ থেকে দেখেছি তারা তো অপ্রিয় সত্য গুলোর সাক্ষী। নীতিগত ও আন্দোলন পরিচালনায় ব্যক্তিগত বিরোধও কম ছিল না। এতকাল পর জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে মনে হয় কিছু ঘটনা, কিছু কথা বলে যাওয়াই ভালে। না হলে আমার জানা সত্যগুলো আমার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাবে।

আমার নিকট বন্ধু— বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মেডিকেল কলেজের অনেকেরই জানা ছিল না যে আমার কক্ষটি (বিশ নম্বর ব্যারাকের ছয় নম্বর রুম) পার্টির আধা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর নেপথ্যে আমার সহপাঠী প্রমথ নন্দীর ছাত্র প্রাক্তন কমিউনিস্ট সদস্য বন্ধু আবদুস সালাম। ঢাকা ও প্রাদেশিক কমিটির নেতা অনেকে এখানে এসেছেন, এমন কি ইলা মিত্রের স্বামী রমেন মিত্র তো ইলা-দি'র হাসপাতালে থাকাকালে প্রতি রাতে এসেছেন, অবশ্য এসেছেন কিছু আগেও। এগুলো বড় তথ্য নয়। বড় নয় এটাও এ যোগাযোগের কারণে ১৯৫৪ সালের ৩০-মে মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। গ্রেফতার এড়াতে আমাকে এক বছরেরও কিছুটা বেশি সময় নিজ ব্যবস্থায় আত্মগোপনে থাকতে হয়।

এহো বাহ্য। আসল কথা হলো আমার এই হোস্টেল কক্ষ ২১ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে পুরো মাসটিতে অলি আহাদ, আবদুল মতিন, শহীদুল্লাহ কায়সারসহ একাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে রাতের আশ্রয় দিয়েছে। এখানে ছোটখাট বৈঠকও হয়েছে। পার্টি সদস্য বন্ধু ইলিয়াস দীর্ঘসময় একক্ষে থেকেছে। সেসবও মূল বক্তব্য নয়। বক্তব্য হল নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা যে-বিষয়ে অন্তত দুটো ঘটনা এখানে উল্লেখ করা চলে।

সম্ভবত ফেব্রুয়ারির পঁচিশ কি ছাব্বিশ তারিখ। সঠিক তারিখ মনে নেই। তবে ঘটনা ঠিকই স্মরণে আছে। আবদুল মতিন তখনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি, কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী, এককথায় বাম মতাদর্শের, নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যসহ। সে সময়টাতেই তার সাথে পরিচয়, পরবর্তী সময়ে বন্ধুত্ব। তার অনেক সময় কেটেছে এই বিশের ছ'য়ে।

আন্দোলন পর্যালোচনায় তার বক্তব্য ছিল শুধু 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে আন্দোলন আর বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এবার জনগণের দাবিদাওয়া এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু অলি আহাদের ভিন্নমত। তার মতে আন্দোলনে ভাটার টান লেগেছে, কাজেই আন্দোলনের ইতি টানা দরকার। যতদূর জেনেছিলাম, কমিউনিস্ট পার্টিরও ছিল একই মতামত। অর্থাৎ জনদাবি যুক্ত করা। অলি আহাদ, আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ ছিলেন এ সময় আন্দোলন সক্রিয় রাখার অন্যতম প্রধান নেতা।

কিন্তু ১৪৪-ধারা ভাঙার বিরোধিতার কারণে নেতৃত্বের মূল স্রোত থেকে মাহবুব বিচ্ছিন্ন। যদিও মেডিকেল হোস্টেলে আসা যাওয়া করছেন, ইচ্ছামত বক্তৃতা

বিবৃতি দিচ্ছেন। আসছেন আবুল হাশিমও। যদিও তাদের সিদ্ধান্ত মাফিক একুশে সকাল থেকে সর্বদলীয় পরিষদ বিলুপ্ত।

কিন্তু সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের এই নেতারা তাদেরই নেওয়া সিদ্ধান্ত (বিশে ফেব্রুয়ারি রাতে) ভুলে গিয়েছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা। তারা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে। ১৪৪-ধারা ভাঙার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেবার ভুল সংশোধন করে। এর কারণ একটাই। নেতৃত্ব তখন কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্রযুব সংগ্রামীদের হাতে। এটা সর্বদলীয় নেতাদের কেউ চান নি। চায় নি এস.এম.হলের ডানপন্থী নেতৃত্ব। যেজন্য তারা একলা চলার নীতি গ্রহণ করে। বিষয়টি আবদুল মতিনের জবানিতেও জানা যায়।

কিন্তু আমি তখনো ভেবেছি, এখনো ভাবি কমিউনিস্ট পার্টি-বিরোধী কার্যক্রমে অভ্যস্ত অলি আহাদকে কেন পার্টি তাদের বলয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। সেটা কি তার সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে? যুবলীগ গঠনে অবদানের কারণে? তবু বলি, পার্টির তৎকালীন কঠিন ডিসিপ্লিন ভাঙায় অলি আহাদের পূর্বোক্ত ভূমিকা ছাড়াও সরাসরি তাকে পার্টি-বিরোধী কথাবার্তা বলতে শুনেছি। এবার আরেকটি উদাহরণ যা আমার লেখা অন্য বইতে অর্থাৎ অলি আহাদের জীবদ্দশায় উদ্ধৃত। অলি আহাদের আচরণের সঙ্গে পরিচিত তার ঢাকা কলেজের সহপাঠী আলী আছগর, ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির পর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। ডা. আছগর এখনো জীবিত যদিও অসুস্থ। গণতন্ত্রী আছগর অলি আহাদের সহপাঠীই নয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। আছগরের কাছেই তার সম্বন্ধে যেসব কথাবার্তা ও আচরণের কথা শুনেছি তা না বলাই ভালো।

এবার মূল প্রসঙ্গ। বেলা দুপুর। তারিখ সম্ভবত ২৫ কি ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২)। দুপুরের খাওয়া শেষে ঘরে ফিরে দেখি অলি আহাদ ও শহীদুল্লাহ কায়সার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। ক্রুদ্ধ অলি আহাদের মুখে কথার খই ফুটছে। এবং তার সবই কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে। শান্ত শহীদুল্লাহ (তখনকার টেকনাম তালেবভাই)। তার যুক্তিতর্কগুলো চেষ্টা করেও প্রকাশ করতে পারছেন না। অলি আহাদের কথার তোড়ে তার কথা ভেসে যাচ্ছে।

তর্কের বিষয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাপা কিছু ইস্তাহার প্রচার ও বিলির জন্য অলি আহাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার। কিন্তু তাতে অলি আহাদের প্রবল আপত্তি। তার কথা, এমনিতেই কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্লিষ্টতায়

আন্দোলনের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ইস্তাহার বিলি করে সর্বনাশের শেষটা পূরণ করার দরকার নেই। ঘরের কোণে রাখা ইস্তাহারের বাণ্ডিলের দিকে আঙুল তুলে অলি আহাদের নির্দেশ: ওগুলো এখান থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন, এখনি। শহীদুল্লাহ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ইস্তাহারে ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র, কোনো জঙ্গি-আন্দোলনের আহ্বান নেই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। কোনো যুক্তিতে ভবি ভুলবার নয়। তার নির্দেশ জারি করে অলি আহাদ দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার মুখে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়ানো তালেবভাই বললেন: 'চিন্তা নেই, এগুলো সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছি।' একমাত্র আমি এ অস্বাভাবিক ঘটনার নীরব সাক্ষী। পরে ইস্তাহারগুলো আমার ঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা-আন্দোলনের ক্ষতি করেছে এমন উদ্ভট অভিযোগ শুনেছেন কেউ কোনোদিন? এক অলি আহাদ, এবং তমদ্দুন মজলিসের দু'একজন নেতা, অন্যদিকে নুরুল আমিন প্রশাসন ছাড়া হয়তো এমন কথা কেউ বলে নি, বলার কথা নয়। তবে কিছুটা আভাস ফুটেছিল একুশে সন্ধ্যায় ছাত্র নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কাজী গোলাম মাহবুবের কণ্ঠে, ঐ একবারই। গাজিউল হক বেশ কিছুকাল পরে কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিযুক্ত করেছিলেন একটু ভিন্নভাবে। তবে সরাসরি করেছিলেন এম.আর.আখতার মুকুল। মুকুল বরাবরই বাম-বিরোধী। কিন্তু অন্য দুজন বামাবর্তের হয়েও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। নেপথ্যে বিভ্রান্ত রাজনৈতিক চেতনা।

পরে তাদের মতাদর্শগত পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষ করে গাজিউল হকের। মুকুল অবশ্য প্রথম থেকেই আওয়ামী ঘরানার জাতীয়তাবাদী। তবে অলি আহাদের বিষয়টা আমার কাছে বিস্ময়করই মনে হয়। কমিউনিস্ট পার্টির বলয়ে থেকে পার্টি-বিরোধিতা! অলি আহাদের পূর্বোক্ত অভিযোগ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা-আন্দোলন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকলেও মুসলিম লীগ তথা নুরুল আমিন সরকার তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতোই। পরবর্তী ঘটনাবলী তা প্রমাণ করেছে। তবু বলতে হয় দেশের একটি গণতান্ত্রিক ছাত্রজনতার আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি নিরপেক্ষ থাকবে কেন?

কাজেই ইস্তাহার বিলি, নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা পার্টির জন্য সঠিকই ছিল। ওই ইস্তাহার বরং জনগণের কাছে তাদের ভূমিকা স্পষ্ট করে দিতো। আমি

এখনো অলি আহাদের ঐ ক্রুদ্ধ বিরোধিতার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না। তার অহম্‌বোধ এত প্রবল ছিল যে পার্টির নির্দেশ মেনে চলা তার ধাতে ছিল না। যুবলীগের সভাপতির পদ নিয়ে মোহাম্মদ তোয়াহার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ছিল সদাচার-বহির্ভূত। এমনকি ভাষা-আন্দোলনের একচ্ছত্র নেতৃত্ব নিয়ে আবদুল মতিনের সঙ্গেও ছিল তার দ্বন্দ্ব। ব্যক্তিগত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কারণে দক্ষ সাংগঠনিক শক্তিসম্পন্ন একদা বামপন্থী অলি আহাদ পরে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির শিকার। রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিশিষ্ট স্থান তৈরিতে ব্যর্থ সৈনিক তিনি। তার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক চরিত্রের কথা উমর তার বইতে উল্লেখ করেছেন। ভাষা-আন্দোলনে তার বলিষ্ঠ অবদান ও পিছুটান দুই-ই সমান সত্য।

তবু আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে ক্লান্তিহীন তৎপরতা

ভাষা-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে ব্যক্তিবিশেষ বা বিভিন্নমহলে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া পার্টিকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। এটা অবশ্য ঢাকায় অর্থাৎ কেন্দ্রে। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরে বা গ্রামেগঞ্জে নয়। সেসব স্থানে কোথাও কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন যুবলীগ বা কোথাও শ্রমিক সংগঠন নেতৃত্ব দিয়েছে, কোথাও অন্য গ্রুপের নেতৃত্বে একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে। যশোর, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া বা ময়মনসিংহ-এর মতো একাধিক অঞ্চলে। যত সমস্যা দেখা দিয়ে ছিল কেন্দ্রে তথা ঢাকায়।

এসব কারণে ভাষা-আন্দোলন দুর্বল হয়েছে, অন্তর্নিহিত শক্তি বিভাজিত হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনকে জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করা যায় নি। তাই নুরুল আমিন সরকারের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়েছে প্রচণ্ড দমননীতির মাধ্যমে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়া। নেতৃত্ব একান্তভাবে ছাত্রযুব নির্ভর হওয়ার কারণে ২৭ ফেব্রুয়ারি ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ ও ছাত্রদের হল-হোস্টেল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়ার ফলে পরদিন থেকে আন্দোলন ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যেজন্য ঢাকায় ৫ মার্চের হরতাল সফল ভাবে পালিত হয় নি।

ছাত্রদের সঙ্গে শ্রমিক জনতার নেতৃত্ব যুক্ত হলে, যেমনটা চেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি ঢাকায় এত তাড়াতাড়ি আন্দোলন বন্ধ হতো না। ঢাকার বাইরে শহরগুলোতে তো ঢাকায় আন্দোলন স্তব্ধ হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন আন্দোলন যথেষ্ট শক্তি নিয়ে সচল ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে এবং জনস্বার্থের কর্মসূচি না থাকার কারণে আন্দোলন আপন দুর্বলতার টানে স্তব্ধ হয়ে যায়।

তা সত্ত্বেও হাল ছাড়েনি কমিউনিস্ট পার্টি। আন্দোলনের মূল নেতাগণ কারাগারে থাকার সুযোগে কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতার জন্য সুযোগ আসে আন্দোলনের সাংগঠনিক নেতৃত্ব হাতে নেবার। মার্চে আতাউর রহমান খান সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন। পেছনে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা কামরুদ্দীন আহমদের জোর সমর্থনে। তাসত্ত্বেও পরিষদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা জেনেও প্রয়োজনীয় বাস্তবতা মেনে কমিউনিস্ট পার্টি এর পেছনে সমর্থন জুগিয়েছে।

যথারীতি জেলের বাইরে থাকা যুবলীগ কর্মীরা, বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেনা-অচেনা নেতৃস্থানীয় কর্মীরা, মিটফোর্ড স্কুল, মেডিকেল কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের অনুরূপ ছাত্র নেতাকর্মীরা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন। মেডিকেল কলেজ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে লেখক যুক্ত ছিলেন। এই নেতাকর্মীর বৃহত্তর অংশ ছিল প্রগতিবাদী ও কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থক। যেমন মিটফোর্ডের ছাত্র আবু জাফর। এদের লক্ষ্য এপ্রিলে (১৯৫২) বার লাইব্রেরিতে ভাষাবিষয়ক সফল কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠান। নুরুল আমিনের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় এটার প্রয়োজন ছিল।

দুই

কমিউনিস্ট পার্টি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল এ সম্মেলন সফল করে তুলতে। সাতাশে এপ্রিল (১৯৫২) পূর্বোক্ত বার লাইব্রেরি হলে 'ভাষা সম্মেলন' নামে অনুষ্ঠিত সমাবেশ আসলে ছিল ভাষা-আন্দোলনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আয়োজিত আন্দোলনের নেতাকর্মীদের সম্মেলন যেখানে দেশের বিভিন্নস্থান থেকে জড়ো হন নেতাকর্মীরা। এ সম্বন্ধে আগে লেখা হয়েছে। এখানের এইটুকুই বলা যে প্রথম সারির নেতারা জেলে থাকার কারণে মধ্যসারির বামপন্থী নেতাকর্মীরা এ সম্মেলন সফল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও অন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের কাজ করতে দেখেছি।

এসব কিছুর নেপথ্যে বিষণ্ন কমিউনিস্ট পার্টি। অবশ্য দু'বছরের মধ্যে তাদের বিষণ্নতা কেটে যায়। তাদের উদ্যোগে গঠিত যুক্তফ্রন্টের বিপুল নির্বাচনী বিজয়, আনন্দে-ভাসা বিজয় মিছিল। কিন্তু আবারও এক আঘাতে সব তছনছ। পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে ও শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র কখনো স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, বসতে পারাতো দূরের কথা। থেকে থেকে স্বৈরশাসন বা সামরিক শাসন দেশ ও সমাজেরই নয়, রাজনীতিরও চরিত্র নষ্ট

করেছে। অবশ্য গণতন্ত্রীদের। আর বামপন্থীরা পরবর্তীকালে অস্বাভাবিক বিশ্ববিভাজনের শিকার। কোষ বিভাজনের মতো শুধুই বিভাজন। হয়তো কেউ কেউ মানবেন না, কিন্তু আমি এগুলোকে পুরোপুরি আদর্শিক বিভাজন বলে মনে করি না। যাই হোক এসব ভিন্ন প্রসঙ্গ।

ভাষা-আন্দোলনে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সিংহভাগ ইতিবাচক। মাঝেমধ্যে ছোটখাট ভুলভ্রান্তি, বিশেষত সংকটে সিদ্ধান্ত গ্রহণে। আত্মগোপনে থাকার কারণে জনতার নাড়ীর স্পন্দন সঠিকভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব হয় নি সবসময়। তবে একটি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে আপন পদক্ষেপ নির্ধারণে পরদল-নির্ভরতা রাজনৈতিক সুফল দেয় বলে আমার মনে হয় না। ইতিহাসের ঝুলি হাতড়ে দেখি আমাদের উপমহাদেশে এ জাতীয় ঘটনার পরম্পরা ঐতিহ্য তৈরি করেছে। বাংলাদেশে আমরাও কি সেই ধারাবাহিকতার পথ ধরে চলেছি।

বিশ শতকের বিশের দশকে বাম রাজনীতির সূচনা থেকে আমরা উপনিবেশবাদী পরিবেশের ঐতিহ্য অনুসারী। দুঃখজনক যে নিজস্ব মেধার জোরে পথ নির্ধারণে আমাদের আগ্রহ-উৎসাহ কম। শুধু আদর্শের বাস্তবায়নে নয়, কোনো খাতেই স্বনির্ভর হওয়া যেন আমাদের স্বভাবে নেই। সহজ পথ, সংক্ষিপ্ত পথের নেশা আমাদের মধ্যে প্রবল ভাবে কাজ করে। কখনো পশ্চিম কখনো পূর্ব আমাদের পথ দেখায়। নিজের পথ নিজে তৈরি করে নিতে পারি না। আসলে 'পারি না' কথাটা ঠিক নয়। পারার চেষ্টা করি না সেটাই বড় সত্য। অন্যের নির্দেশিত পথে চলা বুঝি আমাদের রাজনৈতিক ভবিতব্য। এক্ষেত্রে বিচক্ষণতার বড় অভাব।

আমার মনে হয় একুশের ভাষা-আন্দোলন রাজনৈতিক স্বনির্ভরতার শিক্ষাটা আমাদের দিয়েছিল। ঘটনার বিচার-ব্যাখ্যা থেকে সে শিক্ষা আমরা নিতে পেরেছি কিনা সেটাই বিচার্য বিষয়। বিচার্যই শুধু নয়, বুঝে নেওয়া যেমন দরকার বাম রাজনীতির সমর্থক মানুষের, তারচেয়েও বেশি দরকার কমিউনিস্ট পার্টির নীতিনির্ধারকদের। তারা সে কাজ কতটা মেধার ব্যবহারে করতে পেরেছেন তা আমার জানা নেই। জানা না থাকলেও এটুকু বুঝি, অবস্থাদৃষ্টে রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরায় বর্তমান পরিস্থিতি বিচারে বুঝি যে তারা সেদিকে মনোযোগ দেন নি। ইতিহাসের ভুলশুদ্ধ থেকে শিক্ষা নেবার চেষ্টা তারা করেন নি। বোধহয় করতে চান নি। সেটাই বড় কথা।

তবে শেষ বিচারে একথাও মানতে হবে যে ভাষা-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সদর্থক ও সদিচ্ছামূলক ভূমিকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক অঙ্গনের নেতৃস্থানীয় মহলে তাদের সমমনাদের পাশাপাশি তাদের বিরোধীপক্ষের সংখ্যাও কম ছিল না। আমি সাধারণ ছাত্রজনতার কথা বলছি না। তাদের সমর্থনের সিংহভাগ পার্টি নির্ধারিত পথেই ছিল। কিন্তু রাজনীতিবিদ এবং ছাত্রযুব নেতৃত্বের একাংশ ছিল বিরোধীপক্ষে– বলা যায় শত্রুপক্ষ। তারা চায় নি এ আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ুক। তাদের পায়ের নিচে জমি শক্ত হোক। এ বিষয়ে বিস্ময়কর অলি আহাদের আচরণ। তাছাড়া আন্দোলনে তাদের ইতিবাচক ভূমিকার কথা রাজনৈতিক মহলে এবং তাদের সমর্থক সাংস্কৃতিক মহলেও উচ্চারিত হতে শুনি না। শুধু সমালোচনাই শুনি।

এসবের কারণ হয়তো কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রায়শ বিরাজমান রাজনৈতিক পরনির্ভরতা, যে-প্রবণতা তাদের নিজ হাতেই তৈরি। এ বিষয়ে তাদের পক্ষে কিছু যুক্তিও দেখানো হতো। একদিকে প্রচণ্ড সরকারি নির্মমতা ও দমন-নীতি, অন্যদিকে রাজনৈতিক সহযাত্রীদের বিরূপতা তাদের যাত্রাপথে বাস্তবিকই এককযাত্রায় বাধা তৈরি করে থাকবে। তাই যতটা না কৌশলগত কারণে তার চেয়ে বেশি আত্মশক্তি বিকাশের প্রয়োজনে আন্দোলনে, প্রতিবাদে ভিন্ন মতাদর্শীদের সঙ্গে তাদের সংঘবদ্ধ যাত্রা। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক বিস্তর।

এ প্রসঙ্গে মানতে হয় যে সংঘবদ্ধ যাত্রায় শক্তিমান শরিকেরই প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে। বাড়ে জনপ্রিয়তা প্রচারের গুণে। যেমন দেখা গেছে ষাটের দশকে ও একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনে ১৯৫২ সালের ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনো একক রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব এখানে ছিল না। একাধিক চিন্তার ছাত্রযুবা গ্রুপ ছিল এ আন্দোলনের রূপকার। আর এর চালিকাশক্তি বা প্রাণশক্তি ছিল ভাষাপ্রেমী সাধারণ ছাত্রসমাজ। তাদের সঙ্গে পরে যোগ দেয় বাঙালি জনতা। তবে মানতে হবে যে মূল ছাত্রযুব নেতৃত্বে ছিল সমাজবাদী, প্রগতিচেতনার প্রাধান্য। এখানেই ভাষা-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির পরোক্ষ সফলতা এবং অবদান।

ভাষা-আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ও সক্রিয় বিশিষ্টজন ও বিশেষ কিছু ঘটনা (১৯৪৭-'৫৬)

প্রাক-আন্দোলন পর্ব:

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবার পর ১৯৪৭-এ মুসলিম লীগের শীর্ষ অবাঙালি নেতাদের কেউ কেউ বলতে শুরু করেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, যেমন ১৭ই মে তারিখে বলেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান। এমন ঘোষণার বিরুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ সামান্য। তবু প্রতিবাদ বলে কথা।

সেই ধারায় দৈনিক ইত্তেহাদ, আজাদ, বা সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকায় বাংলার পক্ষে কয়েকটি প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাংবাদিক আবদুল হক, মাহবুব জামাল জাহেদী, কবি আবুল হোসেন, আবদুল মতিন প্রমুখ এবং পণ্ডিতপ্রবর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এসব তথ্য আগে বলা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ১৯৪৭-আগস্টে দেশভাগ এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই ডোমিনিয়ন– রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। বাঙালি মুসলমান মহাখুশি।

কিন্তু রাষ্ট্রভাষা উর্দুর প্রশ্নটি থেকে থেকে প্রাধান্য পায়। অবশ্য বাংলার পক্ষে সংখ্যায় কম হলেও বিবৃতি ও রচনা প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে কলম ধরেন।

বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে এই তাত্ত্বিক সমর্থন পুরো ১৯৪৭ জুড়েই চলতে থাকে। যেমন বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি (আজাদ, ১১ই নভেম্বর ১৯৪৭)। প্রগতি লেখক শিল্পীসংঘের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা, সাহিত্যিক হবীবুল্লাহ বাহারের মন্তব্য: 'সাহিত্য, কৃষ্টি, তাহজিব ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে বাঙালি এক' (আজাদ, ২৯ অক্টোবর, ১৯৪৭)। আবার এই বাহার সাহেবই সম্ভবত দলীয় চাপের মুখে গণপরিষদে উর্দুর পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন।

এ পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি খাতে উর্দুর পক্ষেই সংখ্যাধিক্য। বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জন করে যখন করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে কেন্দ্রীয়

মন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এ উপলক্ষে ঢাকার ছাত্রদের বিক্ষোভ। পাশাপাশি ঢাকায় বাংলা ও উর্দু সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ (আজাদ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৭)। ছাত্রবিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের কৌশলী মন্তব্য: 'বাঙালিদের ওপর উর্দু ভাষা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই' (দৈনিক আজাদ, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭)।

এসময় উর্দু সমর্থক, বিশেষ করে মুসলিম লীগের বিশিষ্ট কোনো কোনো বাঙালি নেতা ষড়যন্ত্রমূলক কৌশলী ভূমিকা গ্রহণ করে বলতে থাকেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হবে।' ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের বাঙালি চাণক্যগণ ভালো করেই জানতেন যে গোটা পাকিস্তান একটি রাষ্ট্র, সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা কোনো রাষ্ট্রভাষা থাকতে পারে না। যা হতে পারে তা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবহার-উপযোগী প্রাদেশিক ভাষা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা অবশ্যই নয়।

জেনেবুঝে বাংলা রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তারা এ চতুর খেলায় মেতে ছিলেন। তাদের মধ্যে শুধু মন্ত্রী ফজলুর রহমানই নন, ছিলেন মৌলানা আকরম খান, মৌলবী তমিজুদ্দীন খানের মতো বিশিষ্ট বাঙালি মুসলিম লীগ নেতা। তমিজুদ্দীন খান বলেন: 'পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইবে না' (দৈনিক আজাদ, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭)।

একইভাবে মুসলিম হলের সভায় মৌলানা আকরম খানের ঘোষণা: 'উর্দু কিছুতেই বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না' দৈনিক আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭)। এ সম্পর্কে অনুরূপ ধারায় 'আজাদ'-এ সম্পাদকীয় লেখা হয়। আরো এক পা এগিয়ে পাকিস্তান শিক্ষা দফতরের প্রেসনোটে শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কায়দায় বলা হয়: 'উর্দুকে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে মাত্র' (দৈনিক আজাদ, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭)।

আশ্চর্য যে এ সম্পর্কে বাংলাপন্থীরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এগিয়ে আসেন নি, ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন নি কোথায় রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। এ নীরবতার পেছনে কোনো যুক্তি নেই, এর কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুই

একই ধারায় বাংলাপন্থী বাঙালিদের বোকা বানানোর চেষ্টা করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন। তাদের বক্তব্য একই রকম। এক বিবৃতিতে তারা হলেন: 'বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করিবার কোনো ইচ্ছা সরকারের নাই। পূর্ববঙ্গের শিক্ষা ও শাসনকার্যে প্রাদেশিক ভাষাই ব্যবহৃত হইবে' (দৈনিক আজাদ, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮)। তা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গীয় প্রশাসনে ইংরেজিই ব্যবহৃত হয়েছে, বাংলা নয়। পূর্ববঙ্গে তখন আমলাতন্ত্রে উর্দুভাষীরাই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পূর্বোক্ত এই কৌশল-প্রক্রিয়া এবার জোরেসোরে চলে। তবে বড় কথা হলো এতে করে থলের বিড়াল বেরিয়ে এল। অর্থাৎ প্রদেশের সব কিছু প্রদেশের ভাষা বাংলাতেই চলবে। তবে তা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শাসনক্ষমতার বাইরে থাকা আধাবাঙালি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দিও একই সুরে কথা বলেন, তবে একটু কায়দা করে। তারা ভাষায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলাভাষার গুরুত্ব কম নহে' (দৈনিক আজাদ, ২৯-এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)।

রাষ্ট্রভাষা-বিষয়ক এই তাত্ত্বিক লড়াই আসলে জোরদার হয়েছে ১৯৪৭-খ্রিস্টাব্দ শেষে এবং পাকিস্তান গণপরিষদের ১৯৪৮-এর শুরুতে বাংলাকে পরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে উর্দু-ইংরেজির পাশাপাশি গ্রহণ করার জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপন এবং তা বাতিল হওয়ার পর থেকে।

এ তাত্ত্বিক লড়াইয়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক লড়াই ধীর কদমে হলেও শুরু হয় ১৯৪৭-সনের শেষার্ধ থেকে। ঢাকার বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা কামরুদ্দীন আহমদ মুসলিম লীগ ও জিন্নাহ সাহেবের মতিগতি লক্ষ্য করে কিছুটা মোহমুক্ত হয়ে ১৯৪৭ জুনে ঢাকায় এসে গঠন করেন গণআজাদী লীগ। উদ্দেশ্য জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা। কিন্তু মহাপ্রতাপশালী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এর সাংগঠনিক শক্তি ছিল বিন্দুবৎ। তবু এর প্রতীকী গুরুত্ব অনস্বীকার্য ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক সংগঠনের পক্ষে। এ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে তাদের মতামত প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে মতামত লাহোর প্রস্তাবের পক্ষে যাতে পূর্ব পাকিস্তান ছিল এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক সত্তা।

একই বছরে (১৯৪৭) বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল যুবক কলকাতায় বসে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকায় আসেন। এদের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যারা ঢাকায় প্রগতিশীল যুবক মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, নজমুল করিম,

তসদ্দুক আহমদ প্রভৃতির সঙ্গে মিলে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করেন (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭)। এরা প্রকাশ্যে গণতন্ত্রী বাংলাপন্থী, নেপথ্যে বামপন্থী। এদের প্রতি সমর্থন জানান কামরুদ্দীন আহমদ, খান বাহাদুর আবুল হাসনাতের মতো আঙুলে গোনা জনাকয়েক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

আন্দোলনপর্বে (১৯৪৮)

গণতান্ত্রিক শাসন ও বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সূচিত প্রচেষ্টা শুরুতে সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির মুখে খুব একটা সাংগঠনিক বিস্তার ঘটাতে পারে নি। তবু চেষ্টা চলেছে। ভাষার পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য এ পর্বে 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত।

বিস্ময়ের হলেও সত্য যে বিচ্ছিন্ন ছাত্র তৎপরতার মধ্যে নভেম্বরে (১৯৪৭) নীলক্ষেত ব্যারাকের সরকারি কর্মচারিদের বাংলাভাষার পক্ষে সংগঠিত বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মিছিল, স্লোগান ছিল একান্তই স্বতঃস্ফূর্ত। এতে ছিল গণতন্ত্রী ছাত্রযুবাদের সমর্থন। আর পূর্বোক্ত শিক্ষাসম্মেলনে গৃহীত উর্দু রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে ছাত্রযুবাদের বিক্ষোভে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল মোহাম্মদ তোয়াহা, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, কল্যাণ দাশগুপ্ত, নাদেরা বেগম, তাজউদ্দিন আহমদ, আখলাকুর রহমান প্রমুখের। এরা সবাই বাম রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। এছাড়াও ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক আবুল কাসেম, নুরুল হক ভূঁইয়া, শাহেদ আলী প্রমুখ বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তার অনুসারী ব্যক্তিবর্গ।

গণপরিষদের ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব বাতিলের (ইতিপূর্বে উল্লিখিত) প্রতিক্রিয়ায় ১১ মার্চের প্রথম সংগঠিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য (ঢাকায়) কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, নঈমুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ, আজিজ আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, আবদুল মতিন, খালেক নেওয়াজ খান, শামসুল আলম, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (সাংবাদিক) প্রমুখ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ।

এ আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের মধ্যে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য ছাত্রকর্মী ফজলুল করিম, নওয়াব হোসেন, মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, সাইদ হায়দার, আলী আজমল, মঞ্জুর হোসেন, আলী আছগর,

ফরিদুল হুদা, আবু সিদ্দিক মিয়া, এম.আই. চৌধুরী, জসিমুদ্দীন প্রমুখ। এদের মধ্যে শেষোক্ত পাঁচ জন পিকেটিং তৎপরতার সময় গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন।

প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার বাইরে শহরগুলোর সর্বত্র না হলেও প্রধান শহরগুলোতে মার্চের ভাষা-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন পরিচালনায় সরকারবিরোধী সবদলের ভূমিকা সত্ত্বেও গরিষ্ঠসংখ্যক শহরে ছিল বামমতাদর্শের প্রাধান্য। এদিক থেকে জেলাশহর যশোর ১৯৪৮ মার্চে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল এর সর্বদলীয় নেতৃত্ব (সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ)। তা সত্ত্বেও স্থানিক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যে নেতৃত্বে ছিল বিশেষ বিশেষ রাজনীতির প্রাধান্য।

যশোরে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রতিবাদের সূচনা আরো দু'একটি শহরের মতো ১৯৪৭ সালের শেষার্ধ থেকে। যশোরে এম.এম. কলেজের শিক্ষার্থী ছাত্র ফেডারেশনকর্মী হামিদা রহমান আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা ভাষা-বিরোধী একটি রচনার প্রতিবাদে কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় একটি চিঠি লেখেন যা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক শিরোনামে ১০ই জুলাই (১৯৪৭) প্রকাশিত হয়। কারো কারো মতে এ লেখার সূত্রে যশোরে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে আরেক ছাত্র ফেডারেশনকর্মী আফসার আহমদ সিদ্দিকী 'মিল্লাত' পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে একটি চিঠি লেখেন। এভাবে ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্র সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি। ঢাকায় শুরু মার্চের আন্দোলন যশোরে তীব্র গতিবেগ সৃষ্টি করে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাতে সমর্থন জোগায়। তাতেই আন্দোলনের তীব্রতা। এ আন্দোলন সংগঠনে ও পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন ছাত্রলীগের আলমগীর সিদ্দিকী ও সৈয়দ আফজল হোসেন এবং কমিউনিস্ট ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় কর্মী রণজিৎ মিত্র, সুধীর রায়, অনন্ত মিত্র, হামিদা রহমান, আফসার আহমদ সিদ্দিকী, হায়বতুল্লাহ জোয়ারদার। এদের তৎপরতায় যুক্ত হন কংগ্রেস নেতা ডা. জীবনরতন ধর এবং জাতীয়তাবাদী ঘরানার তরুণ আইনজীবী মসিউর রহমান (একাত্তরে শহীদ)।

মহকুমা শহর এবং তেভাগা-আন্দোলন-খ্যাত **নড়াইলে** বামপন্থীরা ভাষা-আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

রাজশাহীতে পরিস্থিতি ছিল প্রায় একই রকম। ১৯৪৮ মার্চের আন্দোলনে প্রধান সংগঠক ইকরামুল হক, মোহাম্মদ সুলতান, গোলাম রহমান, তোফাজ্জল হোসেন তুফুল, গোলাম তাওয়াব, তসিকুল ইসলাম, আবুল কাশেম চৌধুরী, হাবিবুর রহমান শেলী প্রমুখ। নেতৃত্ব মূলত রাজশাহী কলেজ ভিত্তিক। নেপথ্যে কাজ করেন কমিউনিস্ট কর্মী, প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রাণপুরুষ আতাউর রহমান।

রাজশাহীর নিকটবর্তী **চাঁপাইনবাবগঞ্জে** ১৯৪৮-এর আন্দোলন ছাত্রকেন্দ্রীক হয়েও সর্বাত্মক চরিত্র অর্জন করে। ছাত্র ফেডারেশন নেতারা আন্দোলন পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাদের সঙ্গে স্থানীয় গণতন্ত্রী রাজনৈতিক কর্মী ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীমহল এবং রাজনীতি সচেতন জনতা অংশগ্রহণ করে।

মহকুমা শহর **নওগাঁয়** ১৯৪৮ মার্চের আন্দোলন পরিচালিত হয় মূলত যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সমন্বিত প্রচেষ্টায়। এতে নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগের আমীরুদ্দিন, ইব্রাহিম চৌধুরী এবং (কমিউনিস্ট) যুবলীগের আতাউর রহমান। আন্দোলন নওগাঁর থানা ও গ্রামগঞ্জের স্কুলে ছড়িয়ে পড়ে। এতে কৃষকনেতাসহ মাজাহারুল হক, ইব্রাহিম চৌধুরী, খোন্দকার মকবুল হোসেন প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি নেতৃত্ব দেন।

তুলনায় **বগুড়ার** আন্দোলন ছিল অনেক সুসংগঠিত। এখানে রাজশাহীর মতো কলেজ শিক্ষক কারো কারো সমর্থন ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এ সম্বন্ধে আবুল হোসেন খোকন লিখেছেন, '১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ও কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রচ্ছায়ায়' বিক্ষোভের সূচনা। নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন কর্মী ও সাহিত্যকর্মী আবদুল মতীন (ভাষা মতিন নয়)। ১৯৪৮ মার্চের আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা রাখেন রাজশাহীর আতাউর রহমান, অধ্যাপক গোলাম রসুল ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ আবদুল মতীন, আতাউর রহমান (বগুড়া), গোলাম মহিউদ্দিন, ইবনে মিজান ও অধ্যাপক আবুল খায়ের। এদের অধিকাংশ বাম মতাদর্শের।

দিনাজপুর বাম রাজনীতিমনস্ক অঞ্চল। বিশেষ করে তেভাগা আন্দোলনের জন্য খ্যাত। শহর দিনাজপুর অনেকটা সেই প্রভাবে অভ্যস্ত। তাই ১৯৪৮ থেকেই দিনাজপুর ভাষা-আন্দোলনে স্পন্দিত এক শহর। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের কুশীলব। তারা ঢাকার মতোই ১৪৪ ধারা ভেঙে আন্দোলন জারি

রাখে। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বামপন্থী ছাত্রনেতা মীর্জা নুরুল হুদা ছোটি, গোলাম রহমান, আসলেহউদ্দিন আহমেদ এবং গণতন্ত্রী জাতীয়তাবাদী ধারার এম.আর. আখতার মুকুল ও দবিরুল ইসলাম।

তাঁতশিল্পের অঞ্চল **পাবনা** রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য পরিচিত। স্বভাবতই ভাষা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে নি পাবনা। তাছাড়া ছিল গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও আতাউর রহমানের (রাজশাহী) কিছু ইতিবাচক ভূমিকা। পাবনায় ১৯৪৮ ফেব্রুয়ারি মার্চে ভাষা-আন্দোলন পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখে ছাত্র ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, গণতন্ত্রী ধারার ছাত্রলীগ ও একাধিক রাজনৈতিক ধারার কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। সমর্থনে কমিউনিস্ট পার্টি, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও ছাত্র কংগ্রেস। এদের পক্ষে জনসমর্থনও মেলে। সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন বামপন্থী ছাত্রনেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা ও মাহবুবুর রহমান খান। এতেই নেতৃত্বের চরিত্র পরিচয় স্পষ্ট। মার্চের আন্দোলনে বামপন্থী রাজনৈতিক নেত্রী সেলিনা বানু ও সৈয়দ ওয়ারেছ আলী, আনছার আলী প্রমুখের ছিল বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা।

পাবনার মহকুমা শহর **সিরাজগঞ্জেরও** ছিল ভাষা-আন্দোলনে অনুরূপ জনসচেতন ভূমিকা। সিরাজগঞ্জে ১৯৪৮ মার্চের আন্দোলন গতিবেগ অর্জন করে স্থানীয় বামপন্থী ছাত্রনেতা সাইফুল ইসলামসহ মীর আবুল হোসেন ও নজরুল ইসলাম খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে। এছাড়াও ছিলেন নূরে এলাহী, তমিজুল ইসলাম, সুবোধ রায় প্রমুখ। পাবনার মতো এখানেও শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ছাত্র আন্দোলন এভাবে গণআন্দোলনে পরিণত হয়। নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিড়ি শ্রমিক, রিকশা শ্রমিক।

মুসলিম লীগ নেতা সবুর খানের শহর **খুলনা** গণতান্ত্রিক, প্রগতিবাদী আন্দোলনে সমস্যা জড়িত হলেও ১৯৪৮ মার্চের ভাষা-আন্দোলনে পিছিয়ে থাকে নি। অচিন্ত্য বিশ্বাসের বিবরণানুযায়ী 'এই পর্বে খুলনার ভাষা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা আর মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু প্রগতিশীল কর্মী। এই সময় খুলনায় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল প্রভাবশালী' রাজনৈতিক দল।

এ আন্দোলনে তৎপর নেতাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছাত্র ফেডারেশনের স্বদেশ বোস, সন্তোষ দাশগুপ্ত, ধনঞ্জয় দাস, আনোয়ার হোসেন এবং মুসলিম ছাত্রলীগের তাহমীদউদ্দিন আহমদ, জিল্লুর রহমান ও মতিয়ার রহমান প্রমুখ। ছাত্র কংগ্রেসও এতে সমর্থন জোগায়। উল্লেখ্য যে, দৌলতপুর বি.এল. কলেজের গণতন্ত্রী ও প্রগতিবাদী ছাত্ররা এ আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঢাকা জেলার মহকুমা শহর **নারায়ণগঞ্জ**– ১৯৪৮-এর ভাষা-আন্দোলনে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে না পারলেও সে ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছিল ১৯৫২-র ব্যাপক ও তীব্র আন্দোলন সংঘটিত করে। তবে এদিক থেকে আরেক মহকুমা শহর মুন্সীগঞ্জ ছিল ভিন্ন ধারায়। এ অঞ্চল তথা বিক্রমপুর ছিল বামপন্থী আন্দোলনের জন্য খ্যাত।

সম্ভবত এই রাজনৈতিক প্রভাবেই **মুন্সীগঞ্জে** ১৯৪৮ মার্চের আন্দোলন জমে ওঠে যেমন বামপন্থী রাজনীতির ধারায় তেমনি স্থানীয় হরগঙ্গা কলেজের ছাত্র ও কিছু সংখ্যক শিক্ষকের তৎপরতা ও সহযোগিতায়। এ পর্বে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ছাত্র ফেডারেশন কর্মী সফিউদ্দিন আহমদ, অজয় রায়, কমিউনিস্ট নেতা জীতেন ঘোষ এবং এ. কে. আর আহমদ যাদের গ্রেফতার করা হয়। কলেজ-ছাত্রী স্মৃতিকণাগুহ'র নেতৃত্বে স্থানীয় স্কুলের ছাত্রীরাও আন্দোলনে অংশ নেয়।

মহকুমা শহর **মানিকগঞ্জ** ১৯৪৮ সালে সীমিত আকারে হলেও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয় নি। মানিকগঞ্জের ঘিওর থানার তেরশ্রীগ্রামের কে.এন. ইনস্টিটিউট ছিল গোপন কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু, নেপথ্যে ছিলেন শিক্ষক প্রমথনাথ নন্দী। ভাষা-আন্দোলনে তেরশ্রীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে নেতৃত্ব দেন উক্ত স্কুলের ছাত্র ভূপেন্দ্রনাথ দাস, নিকুঞ্জ বিহারী, রেহাজউদ্দীন ও মো. ওয়াজউদ্দিন। এদের গ্রেফতারও করা হয়।

ময়মনসিংহ জেলা সদরে মুসলিম লীগের দাপট সত্ত্বেও রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ১৯৪৭ ডিসেম্বর থেকেই জনমত গড়ে উঠতে থাকে। মার্চে আন্দোলন সারা জেলায় ছড়িয়ে যায়। জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়াও এখানে কম ছিল না। এককথায় ১৯৪৮-এর আন্দোলনে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন শামসুল হক, মোজাম্মেল হক এবং মনোরঞ্জন ধরসহ অন্যান্য নেতারা। এ আন্দোলনে আনন্দমোহন কলেজ ও বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মাঠপর্যায়ে তৎপরতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা ছিল অধিকতর।

ময়মনসিংহ-এর মহকুমা শহর **জামালপুরে** ভাষা-আন্দোলন পরিচালনায় মুসলিম ছাত্রলীগ, কংগ্রেসকর্মী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সম্মিলিত ভূমিকা ছিল লক্ষণীয়।

স্থানীয় ও প্রশাসনিক দমননীতির কারণে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির ছিল নেপথ্য ভূমিকা। স্কুলছাত্র সৈয়দ আবদুস সোহবান তার পঠিত প্রবন্ধে ঝুটা আজাদীর কথা উল্লেখ করেন। স্বভাবতই আবদুস সাত্তার এবং অনুরূপ কয়েকজন ছাত্রসহ সৈয়দ সোবহানকে গ্রেফতার করা হয়। এখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক।

কিশোরগঞ্জ শহর ১৯৪৮ মার্চের ভাষা-আন্দোলনে সাড়া দিলেও মওলানা আতাহার আলী, মুসলেহউদ্দিন প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীলদের কারণে এ পর্বে আন্দোলন ব্যাপক ও জোরদার হতে পারে নি। ১৯৫২ ফেব্রুয়ারিতে সে ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ হয়। একই ঘটনা ১৯৪৮-এ **নেত্রকোনার** ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে সত্য। এ দুটো শহরে আন্দোলনের ব্যাপক প্রকাশ ১৯৫২-ফেব্রুয়ারিতে।

মহকুমা শহর টাঙ্গাইল ভাষা-আন্দোলনে কিছুটা ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এখানে ১৯৪৮-এ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করে আন্দোলন পরিচালনা করা হয়। টাঙ্গাইলের আন্দোলনে কিছু ভূমিকা রাখেন স্থানীয় সন্তান রাজনীতিবিদ শামসুল হক। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হন নুরুল হুদা, তার সঙ্গে কমিটিতে ছিলেন হযরত আলী শিকদার, নুরুল ইসলাম প্রমুখ নেতা।

ফরিদপুরে ভাষা-আন্দোলন ১৯৪৮ মার্চ থেকেই জোরদার হতে থাকে। স্থানীয় রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্ররা এতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নেতৃত্বে ছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ, মাহবুব আলী, আবদুল হালিম, আবদুল বারী, মোল্লা জালালউদ্দিন, লিয়াকত আলী প্রমুখ ছাত্রনেতা। ফরিদপুরে ভাষা-আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল মুসলিম ছাত্র লীগ, সেই সঙ্গে দু'চারজন প্রগতিবাদী ছাত্র-যুবা।

মহকুমা শহর **মাদারীপুর** ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কেন্দ্র। আনিসুর রহমানের ভাষ্যে জানা যায় 'কংগ্রেস নেতা নরেশ দাশগুপ্তের অনুপ্রেরণায় মার্চেন্ট স্কুলের ছাত্ররা ১৯৪৮-এ ভাষা-আন্দোলনের প্রকাশ ঘটায়। বিস্ময়কর যে এই প্রতিবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন স্কুলছাত্র সরদার আবুল ফজল এবং আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আবদুল লতিফ তায়ানী ও সৈয়দ আলী।

বীর **চট্টগ্রাম** স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী উজ্জ্বলতায় আলোকিত। তবু পাকিস্তান আন্দোলনের টানে সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব কম শক্তিমান ছিল না। পাশাপাশি চলেছে প্রগতি সংস্কৃতির চর্চা। ১৯৪৮-এর ভাষা-আন্দোলনে চট্টগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন মূলত প্রগতিবাদীরাই। যেমন মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী, চৌধুরী হারুনুর রশীদ, গোপাল বিশ্বাস, শহীদ সাবের, সুচরিত চৌধুরী। এদের সঙ্গে ছিলেন জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরী, এম.এ আজীজ এবং তমদ্দুন মজলিসের আজিজুর রহমান, এজহারুন হক প্রমুখ।

মহকুমা শহর **ফেনীর** রাজনৈতিক অঙ্গনে ১৯৪৮-এ ছিল তমদ্দুন মজলিসের প্রাধান্য। স্বভাবতই ভাষা-আন্দোলনও একই ধারায় বয়ে গেছে। ফেনী কলেজ এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৪৮-এর আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কোববাদ আহমদ, শামসুল হক, মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। তবে যুবলীগ নেতা খাজা আহমদের প্রভাবও অনস্বীকার্য। ফেনী কলেজের ছাত্র এ.বি এম মুসাও ছিলেন আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারাও ছিলেন আন্দোলনে।

জেলা সদর **কুমিল্লাও** ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনীতি সচেতন শহর। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কামিনীকুমার দত্তের শহর কুমিল্লায় কংগ্রেসী রাজনীতির প্রভাব ছিল যথেষ্ট। এরপরই ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এ ছাড়া ফরোয়ার্ড ব্লক ও র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টদের কিছুটা অবস্থান ছিল। মোটামুটি বামপন্থী নেতৃত্বে সবাই মিলে আন্দোলনের চাকায় গতিযোগ সঞ্চার করেন। ১৯৪৮-এর আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান, জিয়াউল হক, অবিনাশ সাহা, বদরুল হুদা চৌধুরী, চিত্ত বোস, ফয়েজুল্লাহ, সুখেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র।

বায়ান্নে ঢাকার বাইরে আন্দোলনের বিশিষ্টজন

প্রাক-বাহান্নপর্বের কিছু ঘটনা

১৯৪৮-১৯৫১ প্রস্তুতি পর্বে ঢাকায় প্রধান ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন (১৯৫০)। আহ্বায়ক আবদুল মতিন। সেই সঙ্গে ১৯৫০-এ কেন্দ্রীয় সরকারের মূলনীতি কমিটি কর্তৃক গৃহীত উর্দু রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাবের সফল বিরোধিতা। ফলে কমিটির রিপোর্ট স্থগিত হয়। এতে রাজনীতিকদের ছিল প্রধান ভূমিকা– যেমন আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রমুখ।

প্রস্তুতিপর্বের কর্মকাণ্ডে নানাভাবে যুক্ত (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) ছাত্রযুবা নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন আবদুল মতিন, অলি আহাদ, ইমাদুল্লাহ, মোহাম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান, মাহবুব জামাল জাহেদী, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, গাজীউল হক, কমরুদ্দীন শহুদ, আনোয়ারুল হক খান, মৃণাল বাড়ৈ (জগন্নাথ কলেজ) এবং মেডিকেল কলেজছাত্র আলী আজমল, মঞ্জুর হোসেন, আহমদ রফিক প্রমুখ।

এ পর্বে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতা: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল হাশিম, শেখ মুজিবুর রহমান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, খয়রাত হোসেন প্রমুখ। ১৯৫২-ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সরকারদলীয় কিছু সংখ্যক সদস্য (এম.এল.এ) শাসকবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেমন মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, শামসুদ্দীন আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন। বিশেষ ভূমিকায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, বসন্তকুমার দাস, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ সেন (শহীদ) প্রমুখ।

কমিউনিস্ট পার্টির সব সদস্য নেপথ্যে আন্দোলনের ঘটক ও সমর্থক। সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শহীদুল্লাহ কায়সার (আত্মগোপনে থেকে)। একই ভাবে আত্মগোপনে থেকে কর্মরত সাদেক খান। প্রকাশ্যে মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, ইমাদুল্লাহ, মাহবুব জামাল জাহেদী, কে.জি. মোস্তফা, মোহাম্মদ ইলিয়াস (শ্রীহট্ট), আবদুস সামাদ আজাদ, মোহাম্মদ সুলতান, আনোয়ারুল

হক খান, আনোয়ারুল আজিম, এস.এ. বারী এ.টি প্রমুখ বামপন্থী ছাত্রযুবনেতা।

সংক্ষিপ্ত বিবরণে এটা স্পষ্ট যে ভাষা-আন্দোলনের নানাপর্বে বামপন্থী মতাদর্শের ছাত্রযুবাদের ছিল নানামাত্রিক ভূমিকা যা বায়ান্নে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত।

বিস্ফোরক বায়ান্নর আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতাঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, কামরুদ্দীন আহমদ, মীর্জা গোলাম হাফিজ, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল হক প্রমুখ।

প্রত্যক্ষ আন্দোলনে সক্রিয়ঃ সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সদস্য, বিশেষভাবে কর্মতৎপর– মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, অলি আহাদ, ইমাদুল্লাহ, আবদুস সামাদ আজাদ, মোহাম্মদ সুলতান, মাহবুব জামাল জাহেদী, গাজীউল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান, ইব্রাহিম তাহা, কমরুদ্দীন শহুদ, আনোয়ারুল হক খান, এস.এম. নুরুল আলম, শামসুল আলম, এস.এ. বারি, এ.টি, কে.জি মোস্তফা, এম.এ. ওয়াদুদ পাটোয়ারি, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

নানা কাজে সংশ্লিষ্টঃ হাবিবুর রহমান শেলী (২১-এ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রতিক্রিয়ায় গ্রেফতার), এম. আর. আখতার মুকুল, হাসান হাফিজুর রহমান, মোশারফ চৌধুরী, আবদুস সাত্তার, আলী আকসাদ প্রমুখ।

মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের মধ্যে একুশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টঃ গোলাম মাওলা, শরফুদ্দিন আহমদ, আলীম চৌধুরী (একাত্তরে শহীদ), সাঈদ হায়দার, আলী আজমল (২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রতিক্রিয়ায় গ্রেফতার), মঞ্জুর হোসেন, মোহাম্মদ জাহেদ, আলী আছগর, হুমায়ুন হাই, আহমদ রফিক প্রমুখ। তরুণ মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে কর্মতৎপর খোন্দকার মোহাম্মদ আলমগীর, কবিরুদ্দিন, মাহমুদ, আবদুল মানাফ, জিয়া হাসান (পোস্টার লেখা), বদরুল আলম ও নুরুল ইসলাম (পোস্টার লেখা), ইয়াহিয়া (কন্ট্রোল রুম পরিচালনা)।

আন্দোলনে সক্রিয় ছাত্রীঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, সারা তৈফুর, সুফিয়া ইব্রাহিম (আহমদ), রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার

প্রমুখ। ইডেন কলেজের মাহবুবা বেগম, মিটফোর্ড স্কুলের হালিমা খাতুন, নার্গিস আকতার প্রমুখের ছিল সক্রিয় ভূমিকা।

চারুকলার ছাত্রদের নানামাত্রিক কর্মতৎপরতায় যুক্ত ইমদাদ হোসেন, আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর প্রমুখ।

একুশের কবিতা ও গান রচনায় মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সিকান্দার আবু জাফর, ফজল লোহানী, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মোশারেফ হোসেন, তফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

ঢাকার বাইরে আন্দোলনের কুশীলবগণঃ

১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলনে ঢাকায় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে প্রধান শহরগুলোতে ১৯৫২-তে আন্দোলন পরিচালনায় যুক্তদের পরিচয় দিতে গিয়ে ঢাকা-সংলগ্ন **নারায়ণগঞ্জ** দিয়েই শুরু করা যাক।

১৯৪৮-এর তুলনায় অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল নারায়ণগঞ্জে একুশের আন্দোলন। এ গুরুত্ব প্রধানত এর আবেগে, এর তীব্রতায় এবং ব্যাপক জনসংশ্লিষ্টতায়। নারায়ণগঞ্জ এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। এখানকার শ্রমজীবীদের একাংশ এ আন্দোলনে অংশ নেয়।

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রছাত্রী নারী-পুরুষ ও শ্রমজীবী মানুষকে ভাষার দাবিতে সংগঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক শামসুজ্জোহা, মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম, শ্রমিক নেতা সফি হোসেন খান ও আলমাস আলী। ব্যাপক গ্রেফতার ও চণ্ডনীতির প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। জনতা পুলিশের সংঘর্ষের কারণ ছিল মমতাজ বেগমের গ্রেফতার। শুরুতে গঠিত সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মফিজউদ্দিন আহমদ। আজগর হোসেন ভূঁইয়াকে যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। কিন্তু ঘটনার টানে আন্দোলন নিজস্ব ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র নিয়ে চলতে থাকে এবং সরকারের নাশকতামূলক বিপজ্জনক খেলাও চলে প্রতিহিংসার রূপ নিয়ে।

অন্যদিকে গোটা শহরে ১৪৪ ধারা জারির পাশাপাশি হিন্দু প্রধান এলাকায় কার্ফ্যুর চণ্ডনীতি ও নির্বিচার গ্রেফতার চলে। নারায়ণগঞ্জ পরিণত হয় ত্রাসের

শহরে। নেতারা হয় কারাগারে না হয় আত্মগোপনে। এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সরকার নারায়ণগঞ্জে ভাষা-আন্দোলন দমন করতে।

মুন্সীগঞ্জে ১৯৪৮-এর আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নেতাদের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। ১৯৫২ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন যথারীতি ঢাকায় ছাত্র জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিশেষ চরিত্র অর্জন করে। আন্দোলন গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন অজয় রায়, জীতেন ঘোষ, সফিউদ্দিন আহমদ, এম.এ. কাদের, একে আর আহমদ, মাজহারুল সিদ্দিক প্রমুখ। বৃহত্তর বিক্রমপুর এলাকায় আন্দোলন পরিচালনায় ছিলেন রাজনীতিক কফিলউদ্দিন চৌধুরী, কোরবান আলী, জিতেন ঘোষ, এসহাক চাকলাদার, ভবেশ নন্দী প্রমুখ। আর মুন্সীগঞ্জ শহরে মূল শক্তি হরগঙ্গা কলেজের ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

মানিকগঞ্জে ১৯৫২-র আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্রনেতৃবৃন্দ। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় ছাত্রনেতা খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, মীর আবুল খায়ের, ওয়ারেস পাশা প্রমুখ। আন্দোলন ছড়িয়ে যায় মহকুমা শহরের বাইরে স্কুলগুলিকে কেন্দ্র করে।

ময়মনসিংহ শহরে ভাষা-আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া যদিও সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন এবং সম্পাদক রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া। ১৯৪৮-এর মতো ১৯৫২-তেও ভাষা-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন জনাব ভূঁইয়ার পাশাপাশি শামসুল হক, আলতাফ উদ্দিন তালুকদার, মোজাম্মেল হোসেন এবং স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

এদের সঙ্গে ছিলেন হাতেম আলী তালুকদার, মোশারেফ হোসেন আকন্দ, মতলুব আনাম, মাহবুব আনাম, মহাদেব সান্যাল, মীর কফিল উদ্দিন, রজব আলী ফকির প্রমুখ। যে কারণে হোক ময়মনসিংহের আন্দোলনে ছিল রাজনীতিকদের অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য। তাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আওয়ামী লীগপন্থীদের।

অবশ্য **জামালপুরে** ভাষা-আন্দোলনের ১৯৪৮ পর্বে প্রগতিশীলদের প্রাধান্য থাকলেও ১৯৫২-তে সেই সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগপন্থীদেরও ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যেমন ছাত্রলীগের আখতারুজ্জামান, সৈয়দ আবদুস সোবহান প্রমুখ। এক্ষেত্রে সৈয়দ ইমামুর রশীদ প্রমুখ প্রগতিশীল সাহিত্য

কর্মীদেরও ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। সমর্থন ছিল শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের। সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসী নেতারা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতা দিদারুল আলম, আলী আসাদ ও ফজলুল হক যাদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

কিশোরগঞ্জে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তির প্রাধান্য সত্ত্বেও ১৯৫২-তে পৌঁছে স্থানীয় গুরুদয়াল কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের বলিষ্ঠ উপস্থিতিতে ভাষা-আন্দোলন জোরালো প্রতিবাদী চরিত্র অর্জন করে। এ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন ছাত্রনেতা আবু তাহের খান ও ছাত্রনেতা হেদায়েত হোসেন। এদের সঙ্গে ছিলেন আশরাফউদ্দিন মাস্টার, আমিনুল হক, সুন্দর আলী এবং 'তরুণ লাইব্রেরি'র প্রতিষ্ঠাতা আমিনুল হক। এ শহরে সরকারি দমননীতি হয়ে ওঠে চণ্ডপ্রকৃতির। ভাষা-আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে আরো ছিলেন আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী, আবদুস সালাম, আজিমউদ্দিন আহমদ, খুরশিদউদ্দিন ও আবদুল হামিদ।

মহকুমা শহর নেত্রকোণাতেও ভাষা-আন্দোলনের সূচনা ১৯৫২-ফেব্রুয়ারিতে। নেত্রকোণার আন্দোলন মূলত ছাত্রদের হাতে গড়ে উঠলেও এতে জোরালো সমর্থন ছিল টংক আন্দোলন খ্যাত কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের অনুসারীদের। আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন আবদুল খালেক, আবদুল কুদ্দুস, ফুলে হোসেন, অছিমউদ্দিন আহমদ, ফজলুর রহমান খান, আবদুল হাকিম, নুরুল হুদা, আবদুস শহীদ প্রমুখ।

মহকুমা শহর টাঙ্গাইলও ছিল অধিকতর রাজনীতিমনস্ক। মওলানা ভাসানীসহ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের প্রভাব ছিল এখানকার আন্দোলনে। ছাত্রছাত্রীদের ছিল ভাষা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মেয়েদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন ছালেহা, জ্যোৎস্না ও ঝর্ণা। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আন্দোলন সংগঠনে অগ্রণী ভূমিকা নেন শাহজাহান রাইজ, বদিউজ্জামান, মীর্জা তোফাজ্জল হোসেন, বুলবুল খান প্রমুখ।

মাদারীপুরও তখনকার এক মহকুমা শহর (ফরিদপুর জেলার) এবং রাজনীতিক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী। ১৯৪৮-এর মতোই ১৯৫২ ফেব্রুয়ারিতেও আন্দোলন ছিল যথেষ্ট জোরালো। এ আন্দোলনে যারা নেতৃত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সরদার আবুল ফজল, আবদুল মান্নান, সুফি

কাদের, আজিজুল হাওলাদার, শওকত হাওলাদার, আবদুল খালেক, আবদুল ওহাব প্রমুখ।

গোপালগঞ্জের ভাষা-আন্দোলন মূলত ১৯৫২ সালের লক্ষণীয় মাত্রায় পরিস্ফুট। গঠিত হয় 'গোপালগঞ্জ মহকুমা কমিটি' নামে সংগ্রাম কমিটি। আহ্বায়ক স্থানীয় কলেজের ছাত্র সাঈদ আলী খান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক হেলেনা খান। এ ছাড়া যারা এসময় ভাষা-আন্দোলন পরিচালনায় অগ্রণী ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবদুল লতিফ, মুখলেসুর রহমান, জহুরুল হক ভূঁইয়া, ইমানউদ্দিন সরদার, আমিরুল ইসলাম, ফজলুর রহমান, শেখ লুৎফুর রহমান ও আবুল হোসেন ভুঁইয়া।

বিভাগীয় শহর **চট্টগ্রাম** ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগ্রামের শহর। ১৯৪৮ মার্চের মতো ১৯৫২ ফেব্রুয়ারিতেও এ শহর ভাষা-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আন্দোলন পরিচালনায় গঠিত সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক চৌধুরী হারুনুর রশীদ ও এম.এ. আজীজ। এ আন্দোলনে ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে বহুদলীয় চরিত্রের। যেমন একদিকে প্রগতিবাদীরা (যেমন মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী, গোপাল বিশ্বাস প্রমুখ) তেমনি আওয়ামী মুসলিম লীগ (জহুর আহমদ চৌধুরী) ও তমদ্দুন মজলিস (আজিজুর রহমান) এবং শ্রমিকশ্রেণি (চৌধুরী হারুনুর রশীদ) ও শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রতিনিধি। সেই সঙ্গে ছাত্র ও যুবশ্রেণি।

জেলাশহর **কুমিল্লাও** রাজনীতিমনস্ক চরিত্রের। এখানেও আন্দোলন বহু মতাদর্শিক– যেমন আওয়ামী মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, আর.এস.পি. যুবলীগ, কংগ্রেস ও তমদ্দুন মজলিস। ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষকদেরও ছিল বিশেষ ভূমিকা (আসহাবউদ্দিন আহমদ, আবুল খায়ের প্রমুখ)। ছিল সেখানকার ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা। বাদ যায় নি জেলা স্কুলের ছাত্ররা (ছাত্র নেতা শাহ আলম)। পরামর্শক ও সমর্থক আইনজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কামিনীকুমার দত্ত, সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ প্রমুখ এবং শিল্পপতি আবদুর রহমান খাঁ, পৌরসভা চেয়ারম্যান অতীন্দ্রমোহন রায়ের মতো বিশিষ্টজন।

ফেনীও এদিক থেকে পিছিয়ে থাকে নি। ফেনী কলেজের ছাত্র নেতা জিয়াউদ্দিনসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, জাতীয় কংগ্রেস ও তমদ্দুন মজলিসের নেতাদের তৎপরতায় ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন ব্যাপক প্রতিবাদ গড়ে তোলে।

স্থানীয় আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ও বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় কলেজের ছাত্রনেতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পূর্বোক্ত জিয়াউদ্দিনসহ জুলফিকার হায়দার চৌধুরী, লুৎফর রহমান, এম.এ. হানিফ, ফরমানউল্লাহ খান, যুবলীগ নেতা খাজা আহমদ, শামসুল হুদা, এম.এ. হাশেম, কংগ্রেসনেতা কুমুদ দত্ত প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গে একুশের আন্দোলন যথারীতি প্রতিবাদী ঢেউ তোলে। **রাজশাহী জেলা শহর** থেকে দূর গ্রামের স্কুল পর্যন্ত আন্দোলনে শরিক। রাজশাহীতে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আনোয়ারুল আজিম, মমতাজউদ্দিন আহমদ, মেসবাহুল হক, মহসেনা বেগম, সাঈদউদ্দিন আহমদ, মহসিন প্রামাণিক, গোলাম আরিফ টিপু, মেডিকেল ছাত্র আবদুল গাফফার, প্রভাস লাহিড়ী, লুৎফুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। রাজনীতিবিদ মাদারবক্স ছিলেন আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক। সেই সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন শামসুল হক, অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, আমীর হোসেন প্রমুখ। রাজশাহীর আন্দোলনে লক্ষণীয় মেয়েদের সক্রিয় ভূমিকা। এদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় বেগম জাহান আরা, মনোয়ারা রহমান, হাফিজা বেগম, হাসিনা বেগম, রওশন আরাসহ অনেকে। সব মিলিয়ে এখানে ছিল প্রগতিশীলদের প্রাধান্য।

রাজশাহী সংলগ্ন **চাঁপাইনবাবগঞ্জেও** নেতৃত্বের চরিত্র ছিল প্রায় একইরকম। এখানে স্কুল ছাত্ররাই একুশের আন্দোলনকে বিশেষ মর্যাদায় তুলে ধরে। ছাত্রনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মসিউল হক, গোলাম মোহাম্মদ, হাফিজুর রহমান, আবদুল মতিন, আবু সাঈদ, আবুল ফজল প্রমুখ। এদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন রাজশাহীর ছাত্রনেতা গোলাম আরিফ টিপু, ওয়াসেফউদ্দিন, মেসবাহুল হক, মমতাজুর রহমান প্রমুখ। ছোট্ট শহর কিন্তু ভূমিকায় বৃহৎ এই চাঁপাইনবাবগঞ্জ। স্কুলছাত্র আবুল হোসেন ও কুতুবুল আলম (পরবর্তীকালের খ্যাতনামা গম্ভীরা গানের শিল্পী) মিছিল থেকে গ্রেফতার হলে নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন অন্য দুই স্কুল ছাত্র ওবাইদুল হক ও আবু তাহের।

মহকুমা শহর **নওগাঁর** ছিল ভাষা-আন্দোলনে উজ্জ্বল ভূমিকা। যেমন ১৯৪৮-এ তেমনি ১৯৫২-তে। শেষোক্ত পর্বে নেতৃত্বে ছিলেন মোজাম্মেল হক, আবুল খায়ের, রেজাউননবী, গোলাম রাব্বানী, আনোয়ার হোসেন, আতাউল হক, নুরুল ইসলামসহ অনেকে। রাজশাহীর যুবনেতা আতাউর রহমান রাজশাহী শহর বাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁয় আন্দোলন গড়ে তোলায় সাহায্য করেন।

জেলাশহর **বগুড়ায়** যেমন ১৯৪৮-এ তেমনি ১৯৫২-তে ভাষা-আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ার সৃষ্টি করে। একুশের আন্দোলনের পক্ষে গঠিত সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক গোলাম মহিউদ্দিন (বামপন্থী নেতা)। একই রাজনৈতিক ঘরানার নেতা হারুনুর রশীদ এবং কৃষকনেতা জমিরউদ্দিন মণ্ডলও ছিলেন সংগ্রাম কমিটির সদস্য। ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মজিবুর রহমান ও শেখ আবদুল আজিজ ও ছাত্রলীগের আবদুস শহীদ ও নুরুল হোসেন, শ্রমিক নেতা সুবোধ লাহিড়ী, বিড়ি শ্রমিক নেতা শাহ আহমেদ হোসেন, রিকশা শ্রমিক নেতা মোখলেছুর রহমান, তমদ্দুন মজলিসের রুস্তম আলী কর্ণপুরী। এই কমিটিতে এবং আন্দোলন পরিচালনায় ছিল কমিউনিস্টদের প্রাধান্য, ছিল কলেজ ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা।

রংপুরে ভাষা-আন্দোলন মূলত ১৯৫২-ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত। এবং তা স্থানীয় কারমাইকেল কলেজ কেন্দ্রীক। দু'একজন কলেজ শিক্ষক এতে সক্রিয় সমর্থন জানানোর কারণে গ্রেফতার হন। কলেজের ছাত্র নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতিউর রহমান (আওয়ামী লীগ ঘরানার), বামপন্থী ছাত্র নেতা সুফী মোতাহার হোসেন, আজিজুর রহমান, শামসুল হুদা প্রমুখ। রাজনীতিকদের মধ্যে ছিলেন শাহ আবদুল বারী, ইদ্রিস লোহানী, ইউনুস লোহানী, বিশু চৌধুরী, কমিউনিস্ট জননেতা মনিকৃষ্ণ সেন, শংকর বোস, জীতেন দত্ত, শিবেন মুখার্জি, মিলি চৌধুরী, দরাজমণ্ডল প্রমুখ। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ছিলেন আবুল হোসেন। এ জেলাশহরেও দেখা গেছে নেতৃত্বে বামপন্থীদের প্রাধান্য।

শহর **গাইবান্ধায়** ১৯৫২ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন গড়ে তুলতে নতুন করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি মতিউর রহমান, সম্পাদক হাসান ইমাম টুলু। এছাড়া কমিটিতে ছিলেন বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে আজিজুর রহমান, কাজী আবদুল হালিম, খান আলী তৈয়ব, কার্জন আলী, শাহ ফজলুর রহমান, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। এ আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষ করে বিড়ি শ্রমিকদের ছিল বিশেষ ভূমিকা। তবে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল ব্যাপক হারে।

শহর **কুড়িগ্রামেও** আন্দোলন একই ধারায় চলেছে। গঠিত হয়েছে সংগ্রাম কমিটি। কুড়িগ্রামে কলেজ ছিল না। তাই স্কুল ছাত্ররাই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। নেতৃত্বে আবদুল হামিদ, আবদুল আহাদ, বাদল রুদ্র ও হাবিবুর রহমান। এখানেও সক্রিয় শহরের আইনজীবী, পেশাজীবী শ্রেণির নানাস্তরের

মানুষ। সেই সঙ্গে ছিল বিড়ি শ্রমিকদের মিছিলে অংশগ্রহণ। এ আন্দোলনে সহযোগিতায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্টজন যেমন অজিত রায়, জুলহাসউদ্দিন, আলী আমজাদ প্রমুখ। ছাত্রলীগ ও যুবলীগও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে চেষ্টা করেছে।

মহকুমা শহর **নীলফামারিও** বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে পিছিয়ে থাকে নি। তবে এখানে ভাষা-আন্দোলন শুরু একুশের কর্মসূচি উপলক্ষে, বিশেষভাবে ঢাকায় পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিক্রিয়ায়। এ আন্দোলনে ছাত্ররাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগের ছিল প্রাধান্য। আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন শামসুল হক, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী এবং শাফিয়ার রহমান, অলিয়ার রহমান, খোরশেদ আলম, আব্বাস আলী প্রমুখ।

জেলাশহর **দিনাজপুরে** ভাষা-আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৮ থেকে। ১৯৫২ সালেও এ আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নুরুল হুদা ছোটি, আসলেহউদ্দিন প্রমুখ বামপন্থী সংগঠকদের। আরো ছিলেন ছাত্রলীগের দাবিরুল ইসলাম, দলিলউদ্দিন আহমদ, আবদুল হাফিজ প্রমুখ। ছিলেন বামপন্থী ছাত্রনেতা মোহাম্মদ ফরহাদ ও মোহাম্মদ নাসিম। এখানে কমিউনিস্ট নেতারা নেপথ্যে, কখনো প্রকাশ্যে ভাষা-আন্দোলন বাস্তবায়নের সাহায্য করেছেন। বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য কমিউনিস্ট কৃষকনেতা হাজী দানেশ ও গুরুদাস তালুকদারের সাহসী ভূমিকা। স্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষকদের ছিল এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা, যেমন বাংলার অধ্যাপক মাহমুদ মোকাররম। ছিল শ্রমজীবী মানুষের সহযোগিতা।

ভাষা-আন্দোলনে **পাবনার** ভূমিকাও একাধিক শহরের মতো সাহসী ও উজ্জ্বল। যেমন ১৯৪৮-এ তেমনি ১৯৫২-তে। এখানে এডোয়ার্ড কলেজের ছাত্রদের নেতৃত্বে ভাষা-আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যায়। একুশে পর্বের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্রলীগের আবদুল মোমিন তালুকদার। তার সঙ্গে ছিলেন বামধারার রণেশ মৈত্র, আবদুল মতীন, নঈমুল হাসান প্রমুখ। এ পর্বেও আন্দোলন শহর পাবনা থেকে ঈশ্বরদী, চাটমোহরের মতো বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও ছিল সাহসী ভূমিকা। ছাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুফিয়া বেগম, জাহানারা প্রধান, নূরজাহান বেগম, হালিমা খাতুন প্রমুখ।

রাজনীতি সচেতন ও তাঁতঅঞ্চল হিসেবে খ্যাত মহকুমা শহর **সিরাজগঞ্জও** একুশের আন্দোলনে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। এ পর্বে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন **১৯৪৮**-এর অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতা সাইফুল ইসলাম। এ আন্দোলনে ছাত্ররাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

আন্দোলনে ছাত্রীদের ছিল বিশেষ ভূমিকা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইলা, হেনা, মেহের নিগার, বিজলি, মানিক প্রমুখ। এছাড়া ছাত্রদের মধ্যে নুরুন্নবী খান, রামকৃষ্ণ সাহা, কামাল লোহানী, সূর্য কুমার দে, মুরাদুজ্জামান প্রমুখ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

খুলনায় ১৯৫২-র আন্দোলনে মূল কারিগর ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তার এম.এ. গফুর। তার সঙ্গী এ. কে. শামসুদ্দীন, এম.এ. বারী, তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ। আন্দোলনে দৌলতপুর বি.এল. কলেজের ভূমিকা এবারও অগ্রচারীর। এখানে আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন মিজানুর রহীম, নুরুল ইসলাম, জাহিদুল হক। এছাড়াও আন্দোলন সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন আবদুল হালিম, মোহাম্মদ ফেরদৌস, আলতাফ হোসেন খান, নুরুল ইসলাম, খন্দকার আবদুল হাফিজ, এম. এ. জলিল, এ. কে. শামসুদ্দীন, এম.এ. বারী, এনামুর রহমান প্রমুখ। সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন এম.এ. গফুর। খুলনার ভাষা-আন্দোলনে ছাত্রীদেরও ছিল সংগ্রামী ভূমিকা। আন্দোলনের তুঙ্গ পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এতে সমর্থন জানান আবদুল জলিল, আবদুল জব্বার, দেলদার আহমদ, গোলাম সাঈদ, আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

মহকুমা শহর বাগেরহাট ১৯৫২ সালেও ভাষা-আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ ও হাইস্কুলের ছাত্ররা ছিল এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায়। ছাত্রীদেরও এগিয়ে আসতে দেখা গেছে। আন্দোলন পরিচালনায় গঠিত সংগ্রাম কমিটিতে ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক ও পেশাজীবী বিশিষ্টজন। যেমন মনসুর আলী, নূর মোহাম্মদ, আবদুল খালেক, মারুফুর রহমান, আশরাফ আলী প্রমুখ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অধ্যাপক জীতেন্দ্র লাল, অধ্যাপক কালিপদ মুখার্জি, জহুরুল হক প্রমুখ।

জেলাশহর **যশোরে ১৯৫২**-র আন্দোলন ছিল **১৯৪৮**-এর সংগ্রামী ভূমিকার প্রতিচ্ছবি। মিছিলে, স্লোগানে উত্তপ্ত শহর। সভা সমাবেশ ও ধর্মঘটে প্রায় অচল শহর। ছাত্রদের তৎপরতায় সমর্থন জানায় রাজনৈতিক দলগুলো। **১৯৪৮**-এর মতো এবারও আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। টাউন হল মাঠের জনসভার সভাপতি অধ্যাপক আবুল ওয়াহেদ।

মহকুমা শহর **নড়াইলে** ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন প্রধানত বামপন্থী রাজনীতি প্রভাবিত। এখানে ছাত্র, ছাত্রী ও রাজনৈতিক নেতারা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বাম রাজনীতিবিদ আফসার আহমদ মোক্তার। এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন নুরুল আম্বিয়া, এলাহি বক্স, মোফাজ্জেল, বিমল বিশ্বাস, নেপাল সরকার, তেভাগা নেতা নূরজালালের কন্যা রিজিয়া বেগম প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় ভাষা-আন্দোলনের সূচনা ১৯৫২-ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ছাত্র জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিক্রিয়ায়। এ আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকাই প্রধান। জনৈক প্রতিবেদকের মতে ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ের ছিল অগ্রণী ভূমিকা।

এতে শাহিদা খাতুন ছিলেন সামনের সারিতে। সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আবদুল হক, কাসেম আলী, মহসিন আলী প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে যথারীতি ছাত্রছাত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ছাত্রনেতা মোহাম্মদ শাহজাহান ও শিক্ষক রেফাতুল্লাহর নেতৃত্বে আন্দোলনের সূচনা। আন্দোলনে বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন আজিজুল হক, ঊষা চ্যাটার্জি, আবুল হাশেম, ওয়াহিদ হোসেন, মজিবর রহমান, শেখ রহিম বক্স, ওয়ালিউর ইসলাম, ফয়জুর রহমান, আবুল খায়ের এবং ছাত্রীদের মধ্যে স্মরণযোগ্য ইলা, বেলা, হেনা, পাখী, পান্না। এছাড়াও ছিলেন শশধর চট্টোপাধ্যায়, সুধীন সরকার, আনোয়ারুল কাদের, খাদেমুল ইসলাম প্রমুখ।

জেলা শহর **বরিশালে** ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন সংঘটিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে। সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগের আবদুল মালেক খান ও যুবলীগের আবুল হাশেমকে যথাক্রমে সভাপতি ও আহ্বায়ক মনোনীত করে। বরিশালে ছিল যুবলীগের প্রাধান্য এবং এর সভাপতি আলী আশরাফের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তবে স্থানীয় বি.এম. কলেজের অগ্রণী ভূমিকাও অনস্বীকার্য। সেখানে নেতৃত্বে সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, বেলায়েত হোসেন, মতিউর রহমান, গোলাম রাব্বানী, সিদ্দিকুর রহমান, আবদুস সাত্তার, সমীর পাল, জসিম বিশ্বাস, গোলাম কুদ্দুস,

মোহাম্মদ ইউসুফ, মোশাররফ হোসেন, সুনীল গুপ্ত প্রমুখ। স্কুল ছাত্রদের মধ্যে এ. কে. এম আজহারউদ্দিনের ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। তার সঙ্গে ছিলেন ছাত্র আবদুল বাকের, মীর আশ্রাফউদ্দিন। মহিলাদের মধ্যে ছিলেন মিসেস হামিদুদ্দিন, হোসনে আরা নীরু, মঞ্জুশ্রী, মাহে নূর বেগম, রানী ভট্টাচার্য প্রমুখ। শহরের বাইরে আন্দোলন সংগঠিত করেন বামপন্থী ছাত্রনেতা আবদুস শহীদ, অতুল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মহকুমা শহর **পটুয়াখালীতে** ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা রাখে যুবলীগ। যুবলীগ নেতা আবদুল খালেক ছিলেন সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক। এছাড়া আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সৈয়দ আশরাফ, ওবায়দুল্লাহ ও যুবলীগ নেতা আবুল হাশেম।

১৯৫২ সালে **সিলেটে** ভাষা-আন্দোলন একই রকম জোয়ারি আবেগে সংঘটিত হয়। সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক পীর হাবিবুর রহমান। সদস্য মহম্মদ আলী ও আবদুর রহিম, নুপূর রহমান, মতছির আলী, সাদাত খান, রাবেয়া মাহমুদ, সৈয়দ মোতাহার আলী, মনিরউদ্দিন আহমেদ, মৌলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন যোবেদা খাতুন চৌধুরী ও নারীনেত্রীগণ। কমিউনিস্ট নেতারাও এতে প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। যেমন বরুণ রায়, অনিমেষ ভট্টাচার্য, অনন্তদেব প্রমুখ। কবি দিলওয়ার, ফারুক চৌধুরী প্রমুখও আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন।

শ্রীহট্টের ভাটি অঞ্চলের সংগ্রামী মহকুমাশহর **সুনামগঞ্জ** যথারীতি ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, তবে তা অংশত ১৯৪৮ মার্চে, প্রধানত ১৯৫২ ফেব্রুয়ারিতে। ব্যাপক আন্দোলনের মুখে শহর অচল হয়ে পড়ে। আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন জেলা শহর থেকে আসা আলতাফউদ্দিন, আবদুল হক, কাজল দাস, মঞ্জু দাস, মকবুল হোসেন প্রমুখ। সুনামগঞ্জে ভাষা-আন্দোলনে মূল কারিগর ছিলেন মুহাম্মদ আবদুল হাই। সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান বামপন্থী আখলাকুর রহমান ছিলেন আন্দোলনে যোদ্ধাদের প্রেরণা।

মহকুমা শহর **মৌলভীবাজারে** শাসক মুসলিম লীগের প্রভাব প্রতিপত্তি সত্ত্বেও সাহসী ছাত্রদের কল্যাণে ভাষা-আন্দোলনের সূচনা। ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণ তাদের প্রেরণা। স্কুলছাত্র গোলাম রাব্বানী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র পোদ্দার, ভূষণ ঘোষ, সত্যেন্দ্র কর, শচীন্দ্র দত্ত, প্রভাস কর প্রমুখের তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। এরা আশপাশের থানা শহরে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ছাত্রদের আন্দোলনে

সহযোগিতা করেন তরুণ আইনজীবী ইউনুছ মিয়া, কুলাউড়ার বামপন্থী ছাত্রনেতা সৈয়দ আকমল হোসেন, আবদুল আজীজ। কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী ছাত্রনেতা শশাংক ঘোষ আত্মগোপনে থেকে আন্দোলনে সহায়তা করেছেন। প্রকাশ্যে সক্রিয় ছিলেন বামঘরানার ছাত্রনেতা পীর হাবিবুর রহমান, বসন্ত রায় প্রমুখ। জনৈক লেখকের সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয় বামরাজনীতি সংশ্লিষ্ট কুলাউড়া ছিল মৌলভীবাজার ভাষা-আন্দোলনের মূল উৎস।

সিলেটের আরেক মহকুমা শহর **হবিগঞ্জেও** ভাষা-আন্দোলন প্রাধান্য পায় ১৯৫২-তে পৌঁছে। বৃন্দাবন কলেজ হয়ে ওঠে আন্দোলনের কেন্দ্র। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল হাই চৌধুরী, আবদুল মতিন চৌধুরী, আজিজুর রহমান, আহমদ হোসেন খান প্রমুখ। আন্দোলন বিস্তার লাভ করে চুনারুঘাট, শায়েস্তাগঞ্জ, আজমিরিগঞ্জ প্রভৃতি থানা এলাকায়। হবিগঞ্জে ভাষা-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন দেওয়ান গোলাম মর্তুজা, ছাত্রনেতা লতিফুর রহমান চৌধুরী, এনামুল হক, সৈয়দ শফিকউদ্দিন আহমেদ, আজিজুর রহমান, আফছার আহমদ, আবদুল হাই চৌধুরী প্রমুখ।

কুমিল্লা জেলার মহকুমা-শহর **ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়** ভাষা-আন্দোলন মূলত ১৯৫২-ফেব্রুয়ারিতে। আন্দোলন প্রধানত ছাত্রদের তৎপরতায়। আর ওই তৎপরদের মধ্যে বিশিষ্ট স্কুলছাত্র সামিউল হক ফটিক। অবশ্য সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন মতিউর রহমান। সক্রিয় সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ, লুৎফর রহমান, আবদুর রহমান, শফিউদ্দিন আহমদ, জিয়াউদ্দিন, সামিউল হক ও সগীর আহমদ খান। এছাড়াও আন্দোলনে অংশ নেন মুহম্মদ মুসা, তাজুল ইসলাম প্রমুখ। আন্দোলন ছাত্রদের হলেও স্থানীয় আইনজীবী ও পেশাজীবীদের সমর্থন ছিল এ আন্দোলনে।

চাঁদপুরে ভাষা-আন্দোলন প্রধানত ১৯৫২-ফেব্রুয়ারিতেই জোরদার হয়ে ওঠে। আন্দোলনের মূল কারিগর স্থানীয় ছাত্রছাত্রীগণ। তবে আইনজীবী ও পেশাজীবীদেরও ছিল সক্রিয় সমর্থন।

সব মিলিয়ে সেখানে উল্লেখযোগ্য ভাষাসংগ্রামী আবুল কাশেম চৌধুরী, ওয়ালিউল্লাহ, চাঁদবক্স পাটোয়ারি, এহসানউল্লাহ, আব্বাসউদ্দিন, রফিউদ্দিন আখন্দ, মতিউর রহমান ও হাবিবউদ্দিন উকিল প্রমুখ।

নোয়াখালিতেও ভাষা-আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য প্রকাশ প্রধানত ১৯৫২-ফেব্রুয়ারিতে। এক্ষেত্রে চৌমুহনী কলেজের ছিল বিশেষ ভূমিকা। আন্দোলনে

বিশেষ ভূমিকা রাখেন যুবলীগের আহ্বায়ক ফজলুল করিম। তার সহযোদ্ধা রইসউদ্দিন ও ফজলুর রহমান। এদের সঙ্গে সক্রিয় হন চৌমোহনী কলেজের ছাত্র আবদুল লতিফ, আবদুর রব চৌধুরী। আন্দোলনে অংশ নেন আবদুল মালেক উকিল, আবদুল হাদী, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, বজলুর রহমান, জীতেন দত্ত ও মকবুল মিয়া প্রমুখ। সক্রিয় সমর্থন ছিল স্থানীয় আইনজীবী, পেশাজীবীদের। মেয়েরাও আন্দোলনে অংশ নেন।

লালমনিরহাটে ভাষা-আন্দোলন ১৯৫২ সালেই বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এ আন্দোলনের কারিগর প্রধানত স্থানীয় ছাত্রসমাজ। এরা ছিলেন স্কুলছাত্র। কিন্তু সাহসী ও রাজনীতিমনস্ক। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন আবদুল কাদের (ভাসানী), শামসুল হক (কমরেড), জহিরউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। স্থানীয় ছাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা জাহানারা বেগমের। আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জহিরউদ্দিন আহমদ এবং সম্পাদক আবদুল কাদের। নেপথ্যে নানাভাবে সাহায্য (অর্থ সাহায্যও) করেন মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (কমরেড), ও আশরাফ আলী প্রমুখ।

ঐতিহাসিক পলাশীর আমবাগানের সান্নিধ্যে মহকুমাশহর **মেহেরপুরও** পিছিয়ে থাকে নি ভাষা-আন্দোলনে। এখানে স্কুল ছাত্ররাই আন্দোলনের নেতাকর্মী। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন স্কুলছাত্র নজীর হোসেন, ইসমাইল হোসেন, সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ। তাদের সহযোদ্ধা আওলাদ হোসেন, কাউসার আলী প্রমুখ। ১৯৫৩ সালে শহীদ দিবস পালনকালে গ্রেফতার হন নজীর হোসেন, কদম রসুল, শামসুল আলম, আবুল কাসেম, ইসমাইল হোসেন প্রমুখ। এরা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। এরা নিছক বাংলাপ্রেমী।

সৈয়দপুরের মতো **ঈশ্বরদীও** অবাঙালি মোহাজের অধ্যুষিত শহর। তা সত্ত্বেও ১৯৫২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রহত্যার প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলন জমে ওঠে। সাহসী সংগঠকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আবু মুসা, বীরেন্দ্রনাথ রায়, আবদুল্লাহ আল মামুন, সুশীল কুমার বিশ্বাস প্রমুখ। এদের পাশে ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা মাহবুব আহমেদ খান ও আফসারউদ্দিন। স্কুল শিক্ষক মজিবর রহমান ও আবুল কালাম আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

বাহান্ন-পরবর্তী তৎপরতা

নতুন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ১৯৫২-এপ্রিলে। আহ্বায়ক আতাউর রহমান খান। ছাত্রাবাস থেকে প্রতিনিধি নিয়ে শূন্যতা পূরণ। কারণ অধিকাংশ ছাত্রযুবনেতা জেলে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রতিনিধি এই লেখক। ২৭ এপ্রিল বার লাইব্রেরিতে ভাষা-আন্দোলনের নেতাকর্মী সম্মেলন। সভাপতি আতাউর রহমান খান। প্রধান বক্তা কামরুদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, মাহমুদ আলী, ইব্রাহিম তাহা প্রমুখ। ছাত্রীবক্তা মিটফোর্ড স্কুল থেকে হালিমা খাতুন।

এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৫২-আগস্টে কুমিল্লা শহরে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন। ঢাকা থেকে ছাত্র লেখক শিল্পীদের কুমিল্লা যাত্রা। লেখকসহ সে যাত্রায় অংশীদার গাজীউল হক, আনোয়ারুল হক খান, রফিকুল ইসলাম (নজরুল বিশেষজ্ঞ রফিকুল ইসলাম নন), আনিসুজ্জামান প্রমুখ অনেকে। সম্মেলনে সেকুলার জাতীয়তাবাদ ও প্রগতিশীলতার প্রাধান্য। রমেশ শীল ও ফণি বড়ুয়ার কবিগান উপভোগ্য। প্রাধান্য রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলসঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের। নাটকে প্রগতিশীলতার গুরুত্ব।

১৯৫৩ (শহীদ দিবস) পালনঃ

ছাত্রাবাসগুলো থেকে আবছা ভোরে প্রভাতফেরী। মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ও কার্জন হল প্রাঙ্গণে প্রথম শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি নির্মাণ। সেখান থেকে প্রভাতফেরীর যাত্রা শুরু গানে শ্লোগানে নগ্নপদে আজিমপুর গোরস্তানে শহীদদের কবরে ফুলের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন। বিকেলে আর্মানিটোলা ময়দানে জনসভা। সে উপলক্ষে বিশাল শোকমিছিল। তদারকিতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান আবদুল ওয়াদুদ পাটোয়ারি, সহযাত্রী অ্যাম্বুলেন্স কোরের পরিচালক মেডিকেল ছাত্র সিরাজুল ইসলাম, আবদুল মজিদ। মিছিলের নেতৃত্বে আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুস সামাদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। এরাই জনসভার প্রধান বক্তা। গোটা ঢাকা শহর স্পন্দিত, আন্দোলিত।

প্রথম শহীদ দিবসে প্রভাতফেরীর গান 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল' এবং 'ভুলবোনা, ভুলবোনা'। উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইডেন ও ঢাকা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার তৈরির ব্যর্থ চেষ্টায় নেতৃত্ব দেন ইকবাল আনসারী খান, আতিকুল ইসলাম। এ পর্বে অবাক হবার মতো ঘটনা গণতন্ত্রী দলের সম্মেলনে পাঞ্জাবী নেতা সরদার শওকত হায়াত খানের বাংলা রাষ্ট্র ভাষার পক্ষে বক্তৃতা। এ পর্বে রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

* মার্চে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় 'পুঁথিপত্র' সংস্থা থেকে যুবনেতা মোহাম্মদ সুলতান কর্তৃক প্রকাশিত একুশে সংকলন যা সরকার নিষিদ্ধ করে।

* মওলানা ভাসানীর বক্তৃতায় বিরোধী দল সমূহের যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান। ডিসেম্বর পাঁচ-এ (১৯৫৩) যুক্তফ্রন্ট গঠন, ঘোষণা হক-ভাসানীর। ১৯৫৪-র ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার শহীদ দিবস পালন।

* ১৯৫৪ সনের শহীদ দিবস উপলক্ষে ভোরে প্রভাতফেরী, বিকেলে বিশাল জনসভা আর্মানিটোলা ময়দানে। প্রভাতফেরীর নতুন গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী'। ছাত্রজনতার ব্যাপক সমর্থনে মুসলিম লীগের পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন। সারা দেশে আনন্দ উল্লাস।

* কার্জন হলে সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনে উপচে পড়া ভিড়। কলকাতা থেকে অতিথি সাহিত্যিকদের আগমন ও বক্তৃতা। এদের মধ্যে ছিলেন মনোজ বসু, নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, কাজী আবুল ওদুদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি, লেখক।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৩০ মে (১৯৫৪) ৯২-ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল ঘোষণা এবং ইস্কান্দার মীর্জার গর্ভনরী শাসন, সারাদেশে ব্যাপক ধরপাকড়, জেলখানা ভর্তি রাজবন্দিতে।

* ১৯৫৫ সনের শহীদ দিবসে (একুশে ফেব্রুয়ারি) পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও ছাত্রাবাসগুলো থেকে স্লোগান: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই/রাজবন্দিদের মুক্তি চাই/ স্বৈরশাসন চলবে না ইত্যাদি। ওড়ে কালো পতাকা, বহু সংখ্যক ছাত্র গ্রেফতার।

* ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত ছোটখাট অস্থায়ী শহীদ মিনার পুলিশ ভেঙে ফেলে। আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রতিবাদী সভা আয়োজনের চেষ্টা পুলিশী তাণ্ডবে ভণ্ডুল। অনেক নেতাকর্মী গ্রেফতার। এর মধ্যে কয়েকজন ছাত্রীও ছিলেন। যেমন ফরিদা বারী মালিক।

* ডি.এ.রশীদ ও মহিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত একুশে সংকলন। গর্ভনরী শাসনের কঠোরতার মধ্যেই ছাত্রদের সাহসী পদক্ষেপের প্রেক্ষাপটে জননেতা ফজলুল হক ১০ এপ্রিল (১৯৫৫) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির ভাষণে সাহসী বক্তব্য রাখেন।

* শেষ পর্যন্ত ১৯৫৫ সনে গভর্নরী শাসন প্রত্যাহার। পূর্ববঙ্গে সমঝোতামূলক মন্ত্রীসভা গঠন করেন কে.এস.পি'র আবু হোসেন সরকার (৬ জুন, ১৯৫৫)। প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত।

* ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে পালিত চিরাচরিত প্রভাতফেরী ও মিছিলের মাধ্যমে। বিকেলে জনসভা পল্টন ময়দানে সরকারি উদ্যোগে এবং আর্মানিটোলা ময়দানে সর্বদলীয় উদ্যোগে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে। শেষোক্তটিতে মানুষের ঢল। এখানে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ– যেমন আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। এছাড়াও বক্তা যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, সমাজতন্ত্রী দলের নেতা পুলিন দে, গণতন্ত্রী দলের নেতা আলী আশরাফ, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের রুহুল আমিন, মহিলা সমিতির শামসুন্নাহার, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির আবদুল মোমিন তালুকদার, রিকশাশ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুস সেলিম প্রমুখ।

* সন্ধ্যায় ময়দানে গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুঃখজনক যে সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব মেডিকেল হোস্টেলের সামনের রাস্তার শহীদ এভিন্যু ও শহীদ সড়ক নামকরণ একালেও বাস্তবায়িত হয় নি। যেমন হয় নি উচ্চশিক্ষায় ও উচ্চ আদালতে মাতৃভাষার ব্যবহার।

* এদিন সকাল ৯টায় মেডিকেল হোস্টেল ও রাস্তা সংলগ্নস্থানে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ভিত্তিস্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম। ভোরে আজিমপুর কবরস্থানে শহীদ স্মৃতি পালনকালে উপস্থিত

বরকতের মা'কে মওলানা ভাসানী 'বাংলার সাড়ে চার কোটি সন্তানের জননী' আখ্যা দেন।

* সবশেষে ১৯৫৬-র সান্ত্বনাসূচক ঘটনা ৯ বছর পর প্রণীত পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দু ও বাংলার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি। কিন্তু সেই সঙ্গে শর্ত যে পরবর্তী ২০ বছর ইংরেজি সরকারি কাজে ব্যবহৃত হবে। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো এত প্রতিবাদী সেকুলার আন্দোলনের পরও পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় 'ইসলামিক রিপাবলিক' (২রা জুন, ১৯৫৬)। বৃথা গেল প্রতিবাদীদের আত্মদান, বছরের পর বছর আন্দোলন। এ সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের সভায় গৃহীত। মূলত ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত সময় পরিসর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছিল ঘটনাবহুল।

শেষকথা

পুনরুক্তির দায় মাথায় নিয়ে সমাপণী বক্তব্যের উপস্থাপনা।

ভাষা-আন্দোলনের তাত্ত্বিক সূচনা ১৯৪৭ সালে, জুন-জুলাইতে। কিন্তু এর বাস্তব রূপ দেখা যায় নভেম্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে। ভাষার দাবিতে সংগঠিতভাবে আন্দোলন শুরু মার্চ আটচল্লিশে, এর বিস্ফোরক প্রকাশ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে। আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ দিক এর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও বলিষ্ঠ প্রতিবাদী বিক্ষোভ এবং পরিশেষে আন্দোলন। দুই পর্বেই এ বৈশিষ্ট্য ছিল লক্ষ্য করার মতো। আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছিল সরকারি নীতি ও পদক্ষেপের অদূরদর্শিতা যা আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সূচনা ঘটাতে সহায়ক হয়েছিল। আন্দোলনের সূচনা ঘটায় সচেতন ছাত্রযুব সমাজ ও কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারি, পরে তাতে জনতার অংশগ্রহণ।

সাংগঠনিক দুর্বলতার অন্যতম কারণ হিসেবে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আসে। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল রূপে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগই ছিল প্রবল শক্তিধর একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। এ সংগঠনের তৎপরতায় ভারতবিভক্তি ও পাকিস্তানের জন্ম, এবং সেটা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে।

চরিত্র বিচারে মুসলিম লীগ যেমন মূলত ভূস্বামী-শিল্পপতি ও উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির স্বার্থবাহক তেমনি ধর্মীয় চেতনাভিত্তিক দ্বি-জাতিতত্ত্বের আদর্শনির্ভর একনায়কী নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক দল। দলে গণতন্ত্রের চর্চা বলতে কিছু ছিল না। জিন্নাহপর্বে সভাপতির কথাই ছিল প্রথম ও শেষ কথা। গণতন্ত্রমনা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা ছিল নিস্তেজ। পশ্চাদপদ এক ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণের প্রতিশ্রুতিসহ নানাদিক থেকে প্রত্যাশিত জীবনের স্বপ্ন তুলে ধরে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। রাজনৈতিক উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা, সর্বোপরি সম্প্রদায়চেতনা নিয়ে দলটির অগ্রযাত্রা, পরিশেষে লক্ষ্য অর্জন। এমন একটি দলের রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতান্ত্রিক চেতনা যেমন স্থান পেতে পারে না তেমনি তাদের শাসনে গণতান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশ তৈরি হওয়ার কথা নয়। বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এ সময় পদে পদে দলিত হয়েছে।

এমন এক বিরূপ পরিবেশেও জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ববঙ্গে কিছু গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে বিক্ষোভ, ক্রমে বিক্ষোভ থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর সূচনা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অধিকার নিয়ে। পাকিস্তান অর্জন মানে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সব সমস্যার সমাধান– এমন বিশ্বাসের মগজধোলাই সত্ত্বেও গণতন্ত্রমনা ও প্রগতিবাদী কিছু সংখ্যক ছাত্র-বুদ্ধিজীবী ভাষার দাবিতে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমজনতার সমর্থন পেতে কিছুটা দেরি হয়েছিল ধর্মীয় মগজধোলাইয়ের কারণে। শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চতুরতা, ধর্মের নামে ও পাকিস্তানের নামে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারও এর কারণ।

দুই

মাতৃভাষা জীবনযাপনের সঙ্গে সর্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট একটি ভাষিক জনগোষ্ঠী তথা জাতিসত্তার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যম। এমন একটি সর্বজনীন চরিত্রের বিষয় ভাষার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে এমনটাই স্বাভাবিক। আগেই বলা হয়েছে মুসলিম লীগ শাসনের তখন প্রবল প্রতাপ, অন্যদিকে শক্তিশালী বিকল্প রাজনৈতিক সংগঠন নেই বললেই চলে। গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং তমদ্দুন মজলিস কোনোটাই তখন সংগঠনগত ভাবে শক্তিমান নয়। পরে নঈমুদ্দিন ছাত্রলীগ মুসলিম লীগের ছাত্রসংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে গঠিত হলো। কিন্তু ওরা মূল সংগঠন উপড়ে ফেলতে পারে নি। মুসলিম লীগ সরকারের তীব্র বৈরিতার মুখে আত্মগোপনে থাকা কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন ছাত্রফেডারেশনের পক্ষে প্রকাশ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন বেশ কঠিনই ছিল। আর কমিউনিস্ট পার্টি বিরূপ পরিস্থিতিতে নেপথ্য থেকে গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে।

সাতচল্লিশের শেষ দিকে এমন এক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভাষার দাবি সামনে চলে আসার পর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোনো বিকল্প ছিল না বাংলা সমর্থকদের পক্ষে। তাই তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে একাধিক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত (ডিসেম্বর '৪৭) হলেও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সত্যটা সবাই আত্মস্থ করতে পারে নি। নিজস্ব সংগঠনের আধিপত্য বিস্তার এবং নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব নিজ হাতের মুঠোয় ধরে

রাখার মানসিকতা প্রধান হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে তমদ্দুন মজলিস ও ছাত্রলীগের মধ্যে।

এটা বিশেষভাবে দেখা গেছে ১৯৪৮-এর ১১ মার্চের আন্দোলনে এবং আন্দোলন স্থগিত করার পর। দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ব্যাপক-ভিত্তিতে গঠিত হওয়ার পরও এভাবে সর্বদলীয় পরিষদে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য। সে দ্বন্দ্ব যেমন আন্দোলন পরিচালনায় ও নীতিকৌশল নির্ধারণে তেমনি মতাদর্শগত সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে। এসব কারণে মজলিস-প্রাধান্যে গঠিত দ্বিতীয় সংগ্রাম পরিষদও নেতৃত্বের দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বেকার আলোচনায় উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে তা স্পষ্ট। দ্বিতীয় পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল আলমের পদত্যাগ ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার দায় স্বীকার তার প্রমাণ।

অথচ তমদ্দুন মজলিস তাদের নেতৃত্বের দক্ষতা ও আন্দোলনের সাফল্য নিয়ে যে অযৌক্তিক দাবি করেছে তা ইতিহাসের বিবরণের সঙ্গে মেলে না। আটচল্লিশে তমদ্দুন-প্রধান সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব সম্পর্কে আবদুল মতিন তার 'ভাষা ও একুশের আন্দোলন' পুস্তিকায় নেতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন।

তার মতে '১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্ব (মূলত তমদ্দুন-প্রধান সংগ্রাম পরিষদ– লেখক) আন্দোলনকে আর এগিয়ে নিতে পারছিলেন না। এর কারণ, নেতৃত্বের কাছে আন্দোলনের দিশা ছিল না' (পৃ. ১১)।

তার মতে ঐ নেতৃত্ব 'ভাষা সমস্যাকে জাতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না।... এই কারণে ভাষা-আন্দোলনকে একটা পর্যায়ের পর এগিয়ে নেওয়ার পথ পান নি। তাদের উচিত ছিল সাধারণ ছাত্রদের উপর ভিত্তি ও নির্ভর করে ভাষার আন্দোলন জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ আন্দোলন এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে আন্দোলন জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে' (পৃ. ১২)।

আন্দোলন জনগণের কাছে পৌঁছানো দূরে থাক, ছাত্র-জনতার প্রবল আগ্রহ মাটিচাপা দিয়ে সংগ্রাম পরিষদ জিন্নাহ সাহেবের সম্মানে এবং সরকারের মিথ্যা আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করে। শুধু তাই নয় এই স্থগিত আন্দোলনকে 'বিরাট সাফল্য' আখ্যা দিয়ে তমদ্দুন প্রধান অধ্যাপক কাসেম একে 'বিজয়' হিসেবে চিহ্নিত করেন যা রাজনীতি-সচেতন ছাত্রজনতা মানতে রাজি ছিল না। শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ সাহেবের কল্যাণে ও লীগশাহীর চাতুর্যে অধ্যাপক কাসেম

কথিত 'বিরাট সাফল্য তথা 'বিজয়' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, ঘটনা তেমন প্রমাণই দেয়।

সংগ্রাম পরিষদের যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল তমদ্দুন মজলিস বনাম কমিউনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থী নেতৃত্ব, এবং তা মূলত মতাদর্শগত, সেই সঙ্গে কর্মপন্থাগত। অন্যদিকে তা ছিল একই সঙ্গে তমদ্দুন মজলিস বনাম ছাত্রলীগ, এবং তা প্রধানত আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার ও ফলাফলগত। আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পর আন্দোলনের কৃতিত্ব নিয়ে ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিসের বিতর্ক থেকে তা বোঝা যায়। তবে কখনো এই দ্বন্দ্ব দেখা গেছে জাতীয়তাবাদী বনাম বামপন্থার মধ্যে।

আশ্চর্য যে মার্চের আন্দোলন লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর সেই প্রভাবে ভাষা সংক্রান্ত তৎপরতায় যে নেতিবাচক অবস্থা বিরাজ করে তখন এবং তারপরও তমদ্দুন মজলিস পূর্বোক্ত সেই দ্বন্দ্ব ধরে রেখেছিল। যেজন্যে প্রাকবাহান্ন ভাষা-আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে তমদ্দুন মজলিসের তেমন কোনো সাংগঠনিক ভূমিকা দেখা যায় না। এমনকি বাহান্নর ঐতিহাসিক আন্দোলনেও নয়।

সম্ভবত সেই হতাশা থেকেই তাদের চেষ্টা ভাষা-আন্দোলনে মজলিসের ভূমিকায় রঙ চড়ানো, আতিশয্যে ভরে তোলা, যার শুরু অধ্যাপক কাসেমের জবানিতে। দীর্ঘকাল পর সেই প্রচারের উত্তরাধিকার ও ট্রাডিশন এখন ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির রূপ নিয়েছে। বলা হচ্ছে ভাষা-আন্দোলনের জনক অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং তমদ্দুন মজলিসই ঐ আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের সঠিক তথ্যভিত্তিক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ইতিহাসগ্রন্থ সেকথা বলে না, যা বলে তা শুরুতে একাধিক অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে সাতচল্লিশে সরকারি কর্মচারিদের স্বতঃস্ফূর্ত অসাংগঠনিক বিক্ষোভ তৎপরতার কথা, এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি সংগঠনের নির্দিষ্ট ভূমিকার ইতিকথা। আর প্রসঙ্গত উল্লেখিত হয়েছে সাংগঠনিক বৃত্তের বাইরে রাজনীতি-সচেতন ছাত্রসমাজের কথা যারা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে আটচল্লিশের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এরাই অর্থাৎ এই সাধারণ ছাত্রসমাজই বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের মূল কারিগর, বলা যায় আন্দোলনের চালিকাশক্তি।

এদের তৎপরতার কারণেই ১৪৪ ধারা অমান্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সম্ভব হয় একুশের আন্দোলনকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে তোলা এবং ছাত্র-আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করা। কাকতালীয়ভাবে হোক বা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক প্রভাবে হোক এদের কর্মতৎপরতা ছিল তৎকালীন নেপথ্যবাসী কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন-বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার সমান্তরাল। উল্লেখ্য যে এদের সঙ্গে একাত্ম হয়েই যুবলীগের নেতাকর্মীরা ১৪৪ ধারা ভাঙার ক্ষেত্রে এবং পরবর্তী আন্দোলনের ধারায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে আমরা এ তথ্যও জানি যে বাহান্নর আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই মূল ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন নি, বিশেষ করে শুরুতে অর্থাৎ ১৪৪ ধারার বাধা অমান্য করে আন্দোলনের সূচনা ঘটানোর ক্ষেত্রে। যেমন আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল হাশিম, শামসুল হক, খয়রাত হোসেন প্রমুখ এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রযুবনেতা কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান, সৈয়দ নুরুল আলম প্রমুখ। এমন কি এদের সঙ্গে একই কাতারে রয়েছেন তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক আবুল কাসেম। আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন এরা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্বে পৌঁছাতে পারেন নি।

তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের মাত্র দুজন ব্যক্তিই ব্যতিক্রমী ধারার অর্থাৎ আপসরফার বিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন যারা যেকোনো প্রকার গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনে নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে এসেছেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই। এদের একজন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অন্যজন শেখ মুজিবুর রহমান। শেষোক্তজন ১৯৫২ সালে আন্দোলনের শুরু থেকেই কারাগারে বন্দি। আর প্রথমোক্ত জন আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থন জুগিয়ে পরে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘসময় ধরে কারাগারে থাকেন।

একটি কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা হয়ে থাকে যে বিশে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে মওলানা ভাসানীর উপস্থিতি গোটা পরিস্থিতি পালটে দিতে পারতো। আপসপন্থীরা ভোটের আশ্রয় নিয়েও জয়ী হতে পারতো না। ভাসানী তখন ছিলেন তার পূর্ব নির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঢাকার বাইরে। স্বভাবতই কমিউনিস্ট প্রভাবিত সংগঠন যুবলীগকে এসব ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব

পালন করতে হয়েছিল। এ কথাটা আমার নয়, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস লেখক বদরুদ্দীন উমরের। এ বক্তব্যে কোনো ভুল নেই।

একুশের ভাষা-আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে শেষ হয়ে যাবার পর বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে তৎপরতার বিষয়টি মূলত রাজনৈতিক নেতাদের হাতের মুঠোয় চলে যায়।

অবশ্য এর প্রধান কারণ আন্দোলনের প্রধান নেতাকর্মীদের অধিকাংশ তখন জেলে, এমনকি মওলানা ভাসানীও। এ পর্যায়ে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য বাহান্ন এপ্রিলে আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক মনোনীত করে নতুন ভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদে কামরুদ্দীন আহমদ ছাড়াও কিছুসংখ্যক ছাত্রপ্রতিনিধি পরিষদের তৎপরতায় যুক্ত ছিলেন, যেমন মিটফোর্ডের ছাত্রনেতা আবু জাফর, জগন্নাথ কলেজের মমিন চৌধুরী প্রমুখ। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে লেখকও আতাউর রহমান খানের সোয়ারিঘাটের বাসায় সম্মেলন প্রস্তুতির বৈঠকে নিয়মিত যোগ দিয়েছে। এপ্রিলের (১৯৫২) ভাষা সম্মেলন প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভাষা-আন্দোলনে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে তথ্যনির্ভর আলোচনার পর উপসংহারে বলতে হয় এ আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষোভের আকারে সাতচল্লিশের নভেম্বর থেকে শুরু হয়। আর সে বিক্ষোভ সভাসমাবেশের উদ্যোক্তা নীলক্ষেত ব্যারাকের সরকারি কর্মচারিদের বড়োসড়ো অংশ। এরপর মার্চের (১৯৪৮) সীমাবদ্ধ আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে তমদ্দুন মজলিস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সঙ্গে ছিল সংগ্রাম পরিষদে অন্তর্ভুক্ত ছাত্রলীগ, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছাত্র নেতা, যেমন মোহাম্মদ তোয়াহা। কিন্তু আন্দোলনের তুঙ্গ পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিস যে তাদের পূর্বোক্ত আপসরফার কারণে তাদের নেতৃত্ব ধরে রাখতে পারে নি তা পূর্বেকার আলোচনায় স্পষ্ট।

তেমনি একই কারণে নেতৃত্ব ধরে রাখতে পারেন নি কামরুদ্দীন আহমদও। এ পর্যায়ে তাজউদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ প্রমুখের ব্যক্তিগত ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা সঙ্গত কারণে পূর্ববঙ্গীয় বিধান সভা ও গণপরিষদের অধিবেশনে যৌক্তিক বক্তব্য প্রদানে সীমাবদ্ধ হলেও উজ্জ্বল। আর

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, আগেই বলা হয়েছে, যা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য পার্টির সদস্যদের কেউ কেউ যেমন রণেশ দাশগুপ্ত, দেওয়ান মাহবুব আলী, এবং ছাত্র ফেডারেশনের বিরল সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রকাশ্য আন্দোলনে যুক্ত থেকেছেন। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুনীর চৌধুরী, কল্যাণ দাশগুপ্ত, তসদ্দুক আহমদ প্রমুখের নামও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

বাহান্নর প্রস্তুতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিনকে বিশেষভাবে তৎপর হতে দেখা গেছে এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় উঠে আসতে দেখা গেছে বায়ান্নর আন্দোলনে। এ আন্দোলনে যুবলীগের ছিল প্রধান ভূমিকা, নেপথ্যে কমিউনিস্ট পার্টি। তবে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও তার ছাত্র সংগঠন কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রসঙ্গে) পিছুটান সত্ত্বেও সার্বিক বিচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

অবশ্য এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্য একটু ভিন্ন। তার মতে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রধান হলেও তখনো পর্যন্ত তার সাংগঠনিক শক্তি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং কর্মী সংখ্যাও ছিল অল্প। মুসলিম ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন হলেও যুবলীগের তুলনায় তার সাংগঠনিক শক্তি ও উদ্যোগও কম ছিল' (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯২)। কিন্তু একুশে ও তার ধারাবাহিকতায় এই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, খয়রাত হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখের ভূমিকা অস্বীকার করা চলে না। যেমন এর ছাত্রসংগঠনের ভূমিকা।

এ বিষয়ে বশীর আল হেলাল লিখেছেন 'নতুন দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ব্যাপকভাবে ও সক্রিয়ভাবে ভাষা-আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন। ছাত্রদের সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে যদিও তাঁরা প্রথম দিকে পুরোদস্তুর তাল মেলাতে পারেন নি, কিন্তু চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে গেলে তাঁরা সাধারণভাবে তার উত্তাপ থেকে গা বাঁচাতে চেষ্টা করেন নি' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩-৭৪)। প্রসঙ্গত এ পর্যায়ে যুবনেতা তাজউদ্দিন আহমদ ও এম.এ. ওয়াদুদ পাটোয়ারি প্রমুখের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমরের মূল্যায়ন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বশীর আল হেলাল তার আলোচনায় যা

বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো এ আন্দোলন 'পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট প্রভাবিত আন্দোলন' এবং তা মূলত যুবলীগকে কেন্দ্র করে। তবে প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদেরও কেউ কেউ তাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার ভাষায় '১৯৪৮ সালে ভাষা-আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট। ১৯৫২ সালের আন্দোলনকে উপর থেকে যাঁরা পরিচালনা করেছিলেন তাঁদের প্রধান দুই নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল মতিন ছিলেন কমিউনিস্ট। এর পরের সারির বহুতর কর্মীও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন' (পৃ. ৫৭৭)। আন্দোলনপর্বে আবদুল মতিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় ছিলেন মার্কসবাদীদের সমমনা।

ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং দলের সদস্য ও সমর্থকদের সঠিক পদক্ষেপ নেবার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন কমিউনিস্ট পার্টির এমন কয়েকজনের যেমন শহীদুল্লাহ কায়সার, মুহম্মদ তকিয়ুল্লাহ প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন বশীর তার বইতে। তবে অলি আহাদ তখনো যে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (পরবর্তী কালে যত প্রতিক্রিয়াশীল হউন না কেন) তা উল্লেখ করা দরকার। একই ভাবে আসে খন্দকার গোলাম মোস্তফার নামও, যদিও জীবনের শেষদিকে ব্যক্তিস্বার্থে আপসবাদের ফাঁদে ধরা দেন।

ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতি উপলক্ষে তমদ্দুন মজলিসের কমিউনিস্ট-বিরোধিতার যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনা সে প্রসঙ্গে বশীর বেশ স্পষ্টভাষায়ই লিখেছেন: যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে 'তমদ্দুন মজলিসের মনোভাব ছিল বেশ তীব্র ও তিক্ত।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁদের যে অভিযোগ তা কতদূর সত্য তাতো আমরা পরে বিচার করে দেখব, কিন্তু তাঁদের অভিযোগ সংক্রান্ত যুক্তির মধ্যে খুব সঙ্গতিও পাওয়া যায় না' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪)। মজলিসের কমিউনিস্ট বিরোধিতা যুক্তিনির্ভর ছিল না, ছিল অন্ধ আদর্শগত বিরোধিতা। বশীরের বিচারেও এমন ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে।

তমদ্দুন মজলিস বনাম কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে আলোচনায় বশীর আল হেলালের মন্তব্য: 'আসলে আবুল কাসেম সাহেবদের জানার বা বোঝার কথা নয় নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রকাশ্য ও গোপন কর্মীদের দ্বারা ভাষা-আন্দোলনকে কী ভাবে কতদূর সাহায্য করেছিলেন। অনেকেই যে মনে করেন,

ভাষা-আন্দোলনকে তাত্ত্বিক ও আদর্শিক পরিচালনা দান করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি, এ কথাকে সত্য মনে না করার কারণ নেই' (পৃ.৫৭৭)।

আমাদের অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এমন কথাই বলে যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাতে দেখা যায় কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমর্থক ছাত্র-যুবাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণের বাস্তবতা যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর বশীরের তমদ্দুন মজলিস বিষয়ক উপরের মন্তব্য সম্পর্কে বলা যায়, কাসেম সাহেব ও তার দু'একজন সহকর্মী, মনে হয় জেনে বুঝেই নিছক মতাদর্শগত বিদ্বেষের কারণে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা এবং তাদের সম্পর্কে অপপ্রচার করেছেন যা ছিল সরকারি অপপ্রচারের অনুরূপ। এ ধরনের মানসিকতা সর্বদলীয় আন্দোলনের অনুকূল হতে পারে না। বাস্তবে তা হয় নি, একথা বলাই বাহুল্য।

সফল কোনো আন্দোলনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো দেখা যায় সংশ্লিষ্ট দল বিশেষের পক্ষে কৃতিত্বের ফসল এককভাবে ঘরে তোলার চেষ্টা। এ প্রবণতা যুক্তিসম্মত নয়, সমর্থনযোগ্যও নয়। পূর্ববাংলায় অনুষ্ঠিত ভাষা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিস এমন প্রবণতার প্রকাশ ঘটিয়েছে যা প্রকৃত তথ্যনির্ভর নয়। সে প্রবণতা দীর্ঘকাল পর ইদানিং প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। তাই ইতিহাস পাঠকের পক্ষে প্রকৃত ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আর ইতিহাস বিকৃতির প্রতিবাদ করাতো ইতিহাসের স্বার্থেই দরকার। তবে সাতচল্লিশ-আটচল্লিশের ভাষা-আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের যে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল সে সত্যও অস্বীকারের কোনো প্রশ্ন উঠে না।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১. শিল্প সংস্কৃতি জীবন, কোহিনূর লাইব্রেরি (১৯৫৮), ২য় সংস্করণ: মৌলি প্রকাশনী (২০০৭)

২. আরেক কালান্তরে, বাংলা একাডেমি (১৯৭৭), ২য় সংস্করণ বাংলা একাডেমি (২০০০)

৩. বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি, মুক্তধারা (১৯৮৬), পরিবর্ধিত সং, অনিন্দ্য (২০১৭)

৪. রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও বাংলাদেশ, রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ (১৯৮৭)

৫. কেমন আছেন, গণ প্রকাশনী (১৯৮৭), ২য় সংস্করণ (১৯৯০), ৩য় সংস্করণ: (২০০৫)

৬. ছোটগল্প: পদ্মপর্বের রবীন্দ্রগল্প, রূপম (১৯৭৮), পরিবর্ধিত সংস্করণ: গ্লোব (১৯৮৭), অনিন্দ্য (২০১২)

৭. একুশের ইতিহাস, আমাদের ইতিহাস, গণপ্রকাশনী (১৯৮৮)

৮. আদি মানবের সন্ধানে, গণ প্রকাশনী (১৯৮৮)

৯. ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য, সাহিত্য প্রকাশ (১৯৯১), ২য় সংস্করণ (১৯৯২), ৩য় সংস্করণ (২০০৫), চতুর্থ সং (২০১২)

১০. ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা, বাংলা একাডেমি (১৯৯৩), ২য় সংস্করণ (১৯৯৮)

১১. বাঙলা বাঙালি আধুনিকতা ও নজরুল, উজ্জ্বল বুক সেন্টার, কলকাতা (১৯৯৫)

১২. ওষুধ-চিকিৎসা-সেবা বৈষম্যের শিকার সাধারণ মানুষ, গণ প্রকাশনী, (১৯৯৫)

১৩. রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (১৯৯৬), অনিন্দ্য প্রকাশ (২য় সংস্করণ)

১৪. এই অস্থির সময়, মৈত্রী প্রকাশনী, কলকাতা (১৯৯৬)

১৫. জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা, মৈত্রী প্রকাশনী কলকাতা (১৯৯৭), চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৩ (২য় সংস্করণ)

১৬. রবীন্দ্র ভুবনে পতিসর, সাহিত্য প্রকাশ (১৯৯৮), নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

১৭. জীবনানন্দ: সময় সমাজ ও প্রেম, অন্য প্রকাশ (১৯৯৯)

১৮. নির্বাচিত কলাম, শিখা প্রকাশনী (২০০০)

১৯. বাংলাদেশঃ জাতীয়তা ও জাতি রাষ্ট্রের সমস্যা, অনন্যা (২০০১)
২০. একাত্তরে পাকবর্বরতার সংবাদভাষ্য, সময় প্রকাশনী (২০০১), ২য় সংস্করণ, (২০১০)
২১. কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা, অনন্যা (২০০১)
২২. ছোটদের ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস, শিখা প্রকাশনী (২০০১)
২৩. ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস ও উত্তর প্রভাব, সময় (২০০২)
২৪. প্রসঙ্গ বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ, কাকলি (২০০২)
২৫. নির্বাচিত প্রবন্ধ, অন্য প্রকাশ (২০০২)
২৬. রবীন্দ্র সাহিত্যের নায়িকারা: দ্রোহে ও সমর্পণে, অন্যপ্রকাশ (২০০৩)
২৭. স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, মাওলা ব্রাদার্স (২০০৩)
২৮. নজরুল প্রতিভার নানা মাত্রা, নজরুল ইনস্টিটিউট (২০০৩)
২৯. পথ চলতে যা দেখেছি, ঐতিহ্য (২০০৫), সাহিত্য প্রকাশ (২০১৪)
৩০. বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার একটি অধ্যায়, মাওলা ব্রাদার্স (২০০৬)
৩১. সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ, গণপ্রকাশনী (২০০৩, ২০০৬)
৩২. কিছুকথা কিছু স্মৃতি, বিজয় (২০০৬)
৩৩. রবীন্দ্রভাবনায় গ্রাম: কৃষি ও কৃষক, গণপ্রকাশনী (২০০৬)
৩৪. নারী প্রগতির চার অনন্যা, সাহিত্য প্রকাশ (২০০৬)
৩৫. চিত্রে ভাস্কর্যে রূপসী মানবী, ঐতিহ্য (২০০৭)
৩৬. বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ, ঐতিহ্য (২০০৭)
৩৭. ফিট থাকুন দেহমনে, দিব্য প্রকাশ (২০০০), চতুর্থ মুদ্রণ (২০১২)
৩৮. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, প্রথমা (২০০৯), একাধিক মুদ্রণ
৩৯. বিষ্ণুদে: কবি ও কবিতা, বিভাস (২০১০)
৪০. সংস্কৃতিচর্চা ও অসমাপ্ত লড়াই, অন্বেষা (২০১০)
৪১. রাজনীতির স্বদেশ বিদেশ, বিভাস (২০১১)
৪২. রবীন্দ্রনাথ এই বাংলায়, ইউ.পি.এল (২০১১)
৪৩. মৃত্যুহীন বিপ্লবী চে গুয়েভারা, গণপ্রকাশনী (২০১১), একাধিক মুদ্রণ
৪৪. রাষ্ট্রভাষার লড়াই, বিভাস (২০১১)
৪৫. রবীন্দ্রনাথ: দেশপ্রেম, মূর্ধন্য, (২০১১)
৪৬. শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, গদ্যপদ্য (২০১১)

৪৭. নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ, অনিন্দ্য প্রকাশ (১ম ও ২য় খণ্ড-২০১১), ২য় মুদ্রণ (২০১৭)
৪৮. দেশবিভাগ: ফিরে দেখা, অনিন্দ্য প্রকাশ (২০১৪), তৃতীয় মুদ্রণ (২০১৫)
৪৯. বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ, অন্যপ্রকাশ (২০১২)
৫০. রবি বাউল ও তার বিচিত্র ভাবনা, অনিন্দ্য প্রকাশ (২০১২)
৫১. ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো, রাঁচী (২০১৩), অনিন্দ্য প্রকাশ (২০১৭)
৫২. রবীন্দ্রচর্চা: বাংলাদেশ, অনিন্দ্য (২০১৩)
৫৩. একান্ত বিচারে বিচিত্রজন, আদী প্রকাশন (২০১৩)
৫৪. বাংলাদেশের কবিতা: দশক ভাঙা বিচার, সময় (২০১৪)
৫৫. স্মরণীয় বরণীয় আপন বৈশিষ্ট্যে, আদী প্রকাশন, (২০১৪)
৫৬. রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি ও নোবেল পুরস্কার, অন্যপ্রকাশ (২০১৫)
৫৭. ভালো থাকার শুলুক সন্ধান, বিভাস (২০১৫)
৫৮. একুশ থেকে একাত্তর, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, (২০১৫)
৫৯. একুশের দিনলিপি, মধ্যমা (২০১৬)
৬০. সময়ের দর্পণে সমাজ ও রাজনীতি, বটেশ্বর (২০১৬)
৬১. ভাষা-সংগ্রামী আহমদ রফিকের সাক্ষাৎকার, বিপ্লবীদের কথা (২০১৬)
৬২. ভাষা-আন্দোলনে ইতিহাস বিকৃতি: তমদ্দুন মজলিস ও কমিউনিস্ট পার্টি (২০১৭)
৬৩. নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ; অন্যপ্রকাশ (২০১৬)
৬৪. কিশোরদের রবীন্দ্রনাথ অন্যপ্রকাশ (২০১৬)
৬৫. শিশুদের রবীন্দ্রনাথ, অন্যপ্রকাশ (২০১৬)
৬৬. ভালো থাকার শুলুক সন্ধান, বিভাস (২০১৪)

কবিতা

১. নির্বাসিত নায়ক, কোহিনূর লাইব্রেরি, (১৯৬৬)
২. বাউল মাটিতে মন, গোমতী (১৯৭০), অনিন্দ্য (২০১২)
৩. রক্তের নিসর্গে স্বদেশ, সুজনেষু (১৯৭৯)
৪. বিপ্লব ফেরারী তবু, রূপম (১৯৮৯)
৫. পড়ন্ত রোদ্দুরে, সাহিত্য সমবায় (১৯৯৪)
৬. Selected poems, Zziggasa (১৯৯৪)

৭. শ্রেষ্ঠ কবিতা, পাঠক সমাবেশ (১৯৯৪)
৮. ভালোবাসা ভালো নেই, গণপ্রকাশনী (১৯৯৯)
৯. নির্বাচিত কবিতা, অনন্যা (২০০১)
১১. বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তিমালা, অনিন্দ্য প্রকাশ (২০১৩)
১২. কবিতা সমগ্র, অনিন্দ্য (২০১৩)
১৩. ইচ্ছামতির ঘরে, গণপ্রকাশনী (২০১০)

গল্প-উপন্যাস
১. অনেক রঙের আকাশ (গল্প সংকলন), স্টুডেন্ট ওয়েজ (১৯৬৪)
২. সবপাখি ঘরে ফেরে, সাহিত্য প্রকাশ (২০০৭)

অনুবাদগ্রন্থ (বিজ্ঞান-বিষয়ক)
১. জীবন রহস্য (The Coil of Life)
২. অণুর দেশে মানুষ (Men and Molecules)
৩. বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (The Trumph of Science)

পরিভাষা
১. চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিভাষা-কোষ, বাংলা একাডেমি

সম্পাদনা
১. ভাষা-আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, মাওলা ব্রাদার্স (২০০৯), ২য় সংস্করণ (২০১২)
২. সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি ভাবনা, সাহিত্য প্রকাশ, (২০০৬)
৩. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও অনুষঙ্গ (তিন খণ্ড) অনিন্দ্য প্রকাশ (২০১৭)